# সমাজ ও সাহিত্য

কাজী আবদুল ওদুদ

মোস্‌লেম পাব্‌লিশিং হাউস,
৩নং কলেজস্কয়ার, কলিকাতা।

প্রকাশক :—
মোহাম্মদ আফজাল-উল্-হক,
মোস্‌লেম পাব্‌লিশিং হাউস,
৩নং কলেজস্কয়ার, কলিকাতা।

মূল্য এক টাকা

Printed by—**Makhan Lal Datta**
*At the Bijoya Press, Dacca.*

'সমাজ ও সাহিত্যে'র সঙ্গে এর পূর্ব্ববর্ত্তী 'নব পর্য্যায়ে'র বিশেষ যোগ আছে, পড়লেই তা বুঝতে পারা যাবে।

যে সমস্ত ইংরেজি বাক্য এতে উদ্ধৃত হয়েছে তার অনুবাদ পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে; আরো দুই একটি প্রয়োজনীয় কথাও সেখানে বলা হয়েছে। একটি বিষয়-সূচীও এতে যোগ করা হয়েছে।

চেষ্টা সত্ত্বেও ছাপার ভুলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় নাই। সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে' আর কি লাভ হবে, পাঠকরা যথাস্থানে শুদ্ধি-পত্র দেখ্তে পাবেন।

বাংলা দেশ একই সঙ্গে ভাবোন্মাদের দেশ ও "বুদ্ধির মুক্তি"-র দেশ। ভাবোন্মাদ থেকে যা পাবার তা পাওয়া শেষ হয়েছে মনে হয়, এখন দীর্ঘ দিনের জন্য "বুদ্ধির মুক্তি" বাঙালীর শরণ্য এই কথাটি এই বইখানিতে বল্‌তে চেষ্টা করা হয়েছে।

আমার পরমপ্রীতিভাজন আবদুল কাদির, শামসুল হুদা, কামাল-উদ্দীন ও 'বুলবুলে'র বেগম শামসুন্‌নাহার ও মুহম্মদ হবিবুল্লাহ্ (বাহার) এই বইখানির জন্য যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করেছেন। ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের যত্নের লঘুতাসাধন করব না।

ঢাকা—আশ্বিন, ১৩৪১

## এই লেখকের

নব পর্য্যায় প্রথম খণ্ড

নব পর্য্যায় দ্বিতীয় খণ্ড

রবীন্দ্রকাব্যপাঠ

নদীবক্ষে

মীর-পরিবার

# সূচী

# সমাজ ও সাহিত্য

## সমাজ

## রামমোহন রায়

### বাল্যজীবন

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রামমোহনের জন্ম। মিস্ কলেটের এই মত মেনে নেবার যোগ্য।

তাঁর বালক-কালের দুইটি ব্যাপার বেশ চোখে পড়বার মতো; একটি, তাঁর মেধাশক্তি, অপরটি, গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে ভক্তি। প্রথমটির বাঞ্ছিততম পরিণতি তাঁর পরিবর্ত্তী জীবনে ঘটেছিল একথা সবাই জানেন; দ্বিতীয়টির পরিণতি কিছু অদ্ভুত। কোনো কোনো ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরুষের জীবনে এমন পরিণতি দেখ্‌তে পাওয়া গেছে, যেমন, বাল্যের চঞ্চল ও তার্কিক নিমাই হয়েছিলেন ভক্তিরসাপ্লুত শ্রীচৈতন্য। কিন্তু অনেকের জীবনে এমন পরিণতি দেখতে পাওয়া যায় না। বালক-বুদ্ধদেবকে আমরা দেখ্‌তে পাই সহানুভূতিসম্পন্ন ও পর্য্যবেক্ষণশীল। বালক-মোহম্মদ সম্বন্ধে যে-সব বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় সমসাময়িক উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ভিতরে তাঁর স্বাতন্ত্র্য। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নাকি পুরোহিতের সন্তান হয়েও দেবতার সম্মুখে নিবেদিত নৈবেদ্য গ্রহণ করতে পারতেন না।—তবে রামমোহনের বাল্যের এই ভক্তিপ্রবণতা উত্তরকালে একটি সুন্দর

পরিণতিও লাভ করেছিল। রামমোহনের যোদ্ধৃবেশ বন্ধুর চোখে এত মহিমময় ও শত্রুর চোখে এত নিষ্করুণ যে তাঁর অন্তরের পরমাশ্চর্য্য কোমলতা তাঁদের চোখে পড়বার অবকাশ পায় না। একটি অন্তঃপ্রবাহী ভক্তিধারা তাঁর ভিতরে ছিল, শুষ্ক জ্ঞানমার্গী তিনি ছিলেন না, একথা আজ সুবিদিত ; তার সঙ্গে একথাও আমরা জানি যে এই পুরুষসিংহ অভিনয়ের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়ে অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নাই, বিগতজীবন বন্ধুর স্মৃতির উদ্দেশে অশ্রু-তর্পণ তাঁর জন্য ছিল অতি স্বাভাবিক। ইংলণ্ডের লোকদের তাঁর সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছিল —the oriental gentleman, versatile, emotional, yet dignified, এটি যথার্থ ধারণা।

এই মেধাবী বালকের ভবিষ্যৎ যাতে গৌরবোজ্জ্বল হয় পিতা রামকান্তের সে-কামনা ছিল। তৎকালের শ্রেষ্ঠশিক্ষা লাভের জন্য বাল্যশিক্ষা সমাপনান্তে রামমোহন পাটনায় প্রেরিত হন নয় বৎসর বয়সে।

## রামমোহন ও মুস্‌লিম সাধনা

পাটনায় কিশোর-রামমোহনের অবস্থিতিকাল সুদীর্ঘ নয়। কিন্তু তাঁর জীবনের উপরে এর প্রভাব গভীর। এই প্রভাবের স্বরূপ একটু বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

হিন্দু ও খৃষ্টান শাস্ত্রের যে-সব আলোচনা রামমোহন করেছিলেন সৌভাগ্যক্রমে সে-সবের অধিকাংশই আমাদের জন্য রক্ষিত আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমান-শাস্ত্র সম্বন্ধে যে-সব সুসম্বদ্ধ ও বিস্তৃত আলোচনা তিনি করেছিলেন, অথবা করবেন আশা করেছিলেন, তার

কিছুই আমাদের হাতে এসে পৌঁছায় নাই। তুহ্‌ফাতুল্ মুওয়াহ্‌হিদীন গ্রন্থে অবশ্য কোরআনের কয়েকটি বচন ও হাদিস সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য আছে; কিন্তু সে-আলোচনা তিনি করেছেন শাস্ত্র বিসর্জ্জন দিয়ে, শাস্ত্র স্বীকার করে' নয়। তবু এই তুহ্‌ফাতুল্ মুওয়াহ্‌হিদীন গ্রন্থ ও তাঁর রচনার নানাস্থানে ইস্‌লাম ও মুসলমান সম্বন্ধে বিক্ষিপ্ত উক্তি আভাস ইঙ্গিত ইত্যাদি থেকে মুস্‌লিম সাধনা সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব, অথবা তাঁর চিত্তের উপরে মুস্‌লিম সাধনার প্রভাবের স্বরূপ, অনেকখানি বুঝতে পারা যায়।

অনেকেই বলেছেন, তাঁর স্বসম্প্রদায়ের প্রতীক-উপাসনার প্রতি তাঁর যে বিতৃষ্ণা, এর মূলে রয়েছে কোরআনের শিক্ষা।—শুধু এইই নয়। খৃষ্টান-সমাজের ত্রিত্ব-বাদ, যিশুর রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, এ সমস্তের প্রতি তাঁর যে বিরূপতা, অথচ যিশু-খৃষ্টের প্রতি তাঁর যে গভীর শ্রদ্ধা, এ-সমস্তেরও মূলে রয়েছে কোরআনের শিক্ষা। যথা:—তারা বলে, আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করেছেন। তাঁরই প্রশংসা! তিনি পরম সমৃদ্ধ। আকাশে ও মাটিতে যা কিছু আছে সব তাঁর। এর সমর্থক কিছু তোমাদের নেই। এমন কথা কি বলছ তোমরা আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে যা তোমরা জান না? (১০:৬৮) আর আমরা মেরি-তনয় যিশুকে পরিচ্ছন্ন নির্দ্দেশ দান করেছিলাম ও তাকে "রুহুল্ কুদুস" (Holy Spirit) দ্বারা বলীয়ান করেছিলাম (২:৮৭)।—যিশুর প্রার্থনা নামে কোরআনে একটি আয়াত আছে, তার অর্থ এই:—"তুমি যদি তাদের শাস্তি বিধান কর (তবে)—তারা তোমারই দাসানুদাস; আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা কর (তবে)—তুমি মহান ও জ্ঞানময় (৫:১১৮)।" প্রসিদ্ধি আছে যিশুখৃষ্টের এই কোরআনোক্ত পরম নির্ভরতার প্রার্থনাটি একদা হজরত মোহম্মদ সমস্ত রাত্রি আবৃত্তি করেছিলেন।

শুধু এই-ই নয়। কোরআনের আরো বহু বাণী রামমোহনের মর্ম্ম স্পর্শ করেছিল। কোরআনের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা জানেন, প্রকৃতির দিকে, মানুষের ইতিহাসের দিকে, কোরআন বারবার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরমকবিত্বপূর্ণ ভাষায় বলা হয়েছে—সূর্য্য চন্দ্র মেঘ বৃষ্টি বসন্ত-বায়ু কেমন করে' আল্লাহ্‌র মহিমাকীর্ত্তন করছে, মানুষের সেবায় এ-সবের নিয়োগ হয়েছে, ফলে জলে শস্যে মানুষের কেমন পরিতোষ-সাধন হচ্ছে, এবং এই সব বিশ্বপাতার অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রামমোহন তাঁর তুহ্‌ফাতুল্‌ মুওয়াহ্‌হিদীন গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই সব যুক্তি যথেষ্ট অনুরাগের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

বিধর্ম্মীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে সে-সম্বন্ধেও কোর-আনে কয়েক জায়গায় সুন্দর উপদেশ আছে, যথা :—আল্লাহ্‌ ভিন্ন তারা অন্যান্য যাদের উপাসনা করে তাদের গালি দিও না, পাছে তারা অজ্ঞানতাবশতঃ সীমা অতিক্রম করে' আল্লাহ্‌কে গালি দেয়··· (৬:১০৯)। যারা···ভালোর দ্বারা মন্দ বিদূরিত করে, তারা সুখকর আশ্রয় লাভ করবে (১৩:২২)। আমার ভৃত্যদের বল যা উত্তম তাই তারা বলুক (১৭:৫৩)। তারাই পরমকারুণিকের দাস যারা বিনম্র হয়ে ধরণীবক্ষে বিচরণ করে, আর অজ্ঞরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে, 'সালাম' (শান্তি) (২৫:৬৩)।

নারীজাতির পক্ষ রামমোহন আজীবন সমর্থন করেছেন। নারীর প্রতি সুবিচার ও সদয় ব্যবহার করবার উপদেশ কোরআনে বিস্তৃতভাবে আছে। যথা :—হে বিশ্বাসিগণ, এটি তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, নারীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমরা তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করবে, আর তোমরা তাদের যা দিয়েছ তার কিছু অংশ ফিরে

পাবার জন্য তাদের বিপন্ন করো না অবশ্য যদি তারা জলজ্যান্তভাবে অন্যায়াচরণ না করে, আর তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার কর ; এর পর যদি তোমরা তাদের ঘৃণা কর তা'হলে, হতে পারে, তোমার এমন একটি জিনিষ অবজ্ঞা করলে যার ভিতরে আল্লাহ্ পর্য্যাপ্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন ( ৪:১৯ )।—নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ব্যবহার হজরত মোহম্মদের নিজের চরিত্রেও লক্ষ্যযোগ্য ; যখন তিনি মদিনার রাজা তখন তাঁর ধাত্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁকে দেখেই তিনি গাত্রোত্থান করলেন ও নিজের উত্তরীয় বিছিয়ে দিলেন তাঁর বসবার জন্য।

কিন্তু কোরআন থেকে সবচেয়ে বড় জিনিষ যেটি রামমোহনের লাভ হয়েছিল সেটি মনে হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের মহিমা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা। তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীতের অল্প কয়েকটিতে ঈশ্বরের মহিমা অতি সুন্দর রূপ লাভ করেছে, সে-সবের পাশে পাশে কোরআনের কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।
সে অতীত গুণত্রয়
ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ তায় কেমনে সম্ভবে।
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে
ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এই মাত্র নিতান্ত জানিবে।

কোরআন ঃ—

…তাঁর তুলনা ব্যক্ত করবার মতনও কোনো-কিছু নাই (৪২:১১)।

আকাশ ও পৃথিবীর অপূর্ব্ব স্রষ্টা,—আর যখন তিনি কোনো-কিছু

সংকল্প করেন তিনি শুধু সেটিকে বলেন, হোক, আর তা প্রকাশ পায় ( ২:১১৭ )।

ভাব সেই একে জলে স্থলে শূন্যে যে সমভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার
আদি অন্ত নাহি যার
যে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে।

কোরআন :—

তিনি জানেন তাদের অগ্রে কি আছে ও তাদের পশ্চাতে কি আছে, তাঁর যেটুকু অনুগ্রহ সেটুকু ভিন্ন তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা ধারণা করতে পারে না ; তাঁর সিংহাসন আকাশ ও পৃথিবীর উপরে বিস্তৃত, আর এই উভয়ের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না…( ২:২৫৫ )।

কে বুঝিবে তার মর্ম্ম
ইন্দ্রিয়ের নহে কর্ম্ম
গুণাতীত পরব্রহ্ম সকল কারণ।

কোরআন :—

দৃষ্টি তাঁকে দর্শন করতে পারে না, কিন্তু তিনি (সব) দৃষ্টি দর্শন করেন। তিনি সূক্ষ্মের পরিজ্ঞাতা—সদাজাগ্রত ( ৬:১০৪ )।

ঈশ্বর, আত্মা বা প্রত্যাদেশ, ইত্যাদির স্বরূপ-চিন্তায় মানুষ বিব্রত হবে এ কোরআনের অভিপ্রেত নয়, যথা :—"তারা তোমাকে প্রেরণা ( প্রত্যাদেশ, আত্মা ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে ; বল, আমার প্রভুর হুকুমে প্রেরণা আসে, আর জ্ঞানের অতি অল্প অংশই তোমাদের দান করা হয়েছে" ( ১৭:৮৫ )। ব্রহ্ম স্বরূপতঃ দুর্জ্ঞেয়, তটস্থ লক্ষণের দ্বারা তাঁকে বুঝতে হয়, এ কথা রামমোহন বারবার বলেছেন।

অনেকের ধারণা—কোরআনের আল্লাহ্ এক দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ অধীশ্বর, তাঁর ভয়ে সমস্ত প্রাণী ভীত, দণ্ড বা পুরস্কার যা খুশী তাই তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবকে প্রদান করেন। এ-সব ভাব যে কোরআনে নাই তা বলবো না। কিন্তু কোরআন একটু বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়লে বুঝতে পারা যায়—কোরআনের আল্লাহ্ অনন্তমহিমান্বিত, সদাজাগ্রত আর প্রেমপ্রবণ। এই আল্লাহ্র বশ্যতা স্বীকার করবার জন্য কোরআনে বারবার বলা হয়েছে—"আমেনু ও আমেলুস্ সালেহাত"—বিশ্বাস কর ও সৎকর্ম্মশীল হও। এই সৎকর্ম্ম বল্তে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সৎকর্ম্মের কথাই ভাবা হয়েছে, যদিও অনেক মুসলমান-ধর্ম্মাচার্য্য সৎকর্ম্মের এই সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাখ্যার উপরে বেশী জোর দেন না। সৎকর্ম্ম (লোকশ্রেয়ঃ) বলতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সৎকর্ম্মের কথাই যে রামমোহন বুঝতেন সে কথা সর্ব্ববাদিসম্মত।

মুসলমানের চিন্তায় কোরআনের স্থান সর্ব্বোচ্চে। কিন্তু এই কোরআন কি ভাবে বুঝতে হবে সে-সম্বন্ধে সব মুসলমান নিশ্চয়ই একমত নন। মানুষের অন্তর্নিহিত বিচারবুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যে-সব মুসলমান কোরআন বুঝতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মোতাজেলা-দল সুবিখ্যাত। মানুষের অন্তরের অনুভূতি বিশেষভাবে তার সত্যোপলব্ধির সহায়ক, এই মত যে-সমস্ত মুসলমান পোষণ করতেন তাঁদের মধ্যে সুফী-সম্প্রদায়ের কোনো কোনো শাখা সুবিখ্যাত। রামমোহনের চোখে যে-ইসলাম মহিমা বিস্তার করেছিল সে-ইস্লাম সর্ব্বসাধারণ মুসলমানের ইস্লাম তেমন নয়। ইস্লামের সেই পরিচিত রূপে তিনি যে তৃপ্ত হতে পারেন নাই, তা বুঝতে পারা যায় তাঁর Second Appeal to the Christian Public—এর এই উক্তি থেকে—

Disgusted with the puerile and unsociable system of Hindoo idolatry, and dissatisfied at the cruelty allowed by Mussalmanism against Non-Mussalmans, I, on my searching after the truth of Christianity, felt for a length of time very much perplexed with the difference of sentiments found among the followers of Christ (I mean Trinitarians and Unitarians, the grand division of them) until I met with the explanation of the unity given by the divine Teacher himself as a guide to peace and happiness. (Panini Office Edition, 1906, Page 580.) তিনি যে-ইস্‌লাম থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলেন সে-ইস্‌লাম মোতাজেলাদের ও শ্রেষ্ঠ সুফীদের ইস্‌লাম।

সাদী হাফিজ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সুফী-সাহিত্যিকদের রচনা তাঁর চিত্তের সন্তোষ-সাধন করেছিল। তাঁর কয়েকটি অতি প্রিয় বচনের মধ্যে একটি হচ্ছে হাফিজের একটি গজলের এই দুই চরণ।

ইহকাল ও পরকালের আরাম এই এক কথায়—
বন্ধুদের নিয়ে উৎসব কর, শত্রুদের সঙ্গে আপোষ কর॥

তাঁর তুহ্‌ফাতুল্‌ মুওয়াহ্‌হিদীন-এ হাফিজের আরো দুইটি বাণী উদ্ধৃত হয়েছে :—

বায়াত্তর দলের ঝগড়া নিরর্থক
সত্য না বুঝে তারা খেয়াল ও মূঢ়তার পথে চলেছে॥

কারো অনিষ্টাচারী হয়ো না, আর যা খুশী কর,
আমাদের পন্থায় এ ভিন্ন আর কোনো পাপ নেই॥

আর সাদীর এই বাণীটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল ;

জীবের সেবা ভিন্ন ধর্ম্ম আর কিছু নয়।
তস্‌বিহ্‌ জায়নামাজ (আসন) ও আলখাল্লায় ধর্ম্ম নাই॥

তিনি নাকি মাঝে মাঝে ইচ্ছাপ্রকাশ করতেন, এই বচনটি যেন তাঁর সমাধি-গাত্রে উৎকীর্ণ হয়। আর ভারতীয় কৃষকদের নিদারুণ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করে' তাদের দুঃখ দূর করবার জন্য East India Company-র কর্ম্মকর্ত্তাদের তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন সাদীর এই বাণীটি উপহার দিয়ে—

প্রজাদের সঙ্গে প্রীতিবদ্ধ হও ও (এই ভাবে) তোমার
শত্রুদের যুদ্ধ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হও।
কেননা ন্যায়পরায়ণ নরপতির সৈন্য হচ্ছে তার প্রজা॥

সুফীদের যে-সব বাণী তিনি উদ্ধৃত করেছেন সে-সবের ভিতর দিয়ে তাঁর চিত্ত সুস্পষ্টভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে। সবাই জানেন, ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ সম্পর্কে সুফী-সাহিত্যে অনেক তত্ত্বপূর্ণ কথা আছে। মৌলানা জালালুদ্দিন রুমির কবিতায় অদ্বৈত-তত্ত্ব আশ্চর্য্য সাহিত্যিক সার্থকতা লাভ করেছে। সে-সবে রামমোহন কতখানি আনন্দিত হতেন তা তেমন জানতে পারা যাচ্ছে না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সুফীদের সুগভীর মানব-প্রেম বা জীব-প্রেম যে তাঁর পরম আনন্দের বিষয় ছিল সেটি অতি সুন্দরভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছে।—বিশেষজ্ঞেরা আজ এ বিষয়ে একমত যে বিশ্বমানবের একত্বের ধারণা রামমোহন সুস্পষ্টভাবে করেছিলেন। সেই বিশ্বমানবের একত্ব সম্বন্ধে সাদীর এই বাণীটি সুবিখ্যাত—

আদম-সন্তানরা একে অন্যের অঙ্গস্বরূপ
কেননা তাদের উৎপত্তি একই মূল থেকে।
যদি এক অঙ্গে বেদনা বাজে
তাহলে অন্য অঙ্গও শান্তিতে থাকে না।
মানুষের দুঃখ যদি তুমি না বোঝো
তাহলে মানুষ নাম নেওয়া তোমার অন্যায় হয়েছে।

সুফী-সাহিত্য রামমোহনের অন্তরকে আনন্দিত করেছিল, কিন্তু তাঁর অন্তর ও বাহির উভয়কে বীর্য্যবন্ত করেছিল মোতাজেলা-বাদ। তাঁর যুক্তিবাদের কয়েকটি প্রধান অস্ত্র গৃহীত হয়েছিল মোতাজেলা-তূণ থেকে, যথা :—

(১) ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান; কিন্তু তিনি নিজেকে ধ্বংস করতে *পারেন না, তাঁর সমকক্ষ আর একজন ঈশ্বর সৃষ্টি করতে পারেন না।*

*(২) ঈশ্বরের গুণ তাঁর সত্তা থেকে পৃথক নয়, গুণের স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করলে ঈশ্বরের একত্ব নষ্ট হয়। প্রধানতঃ এই যুক্তির দ্বারা রামমোহন বিভিন্ন দেবদেবীর ঈশ্বরত্বের দাবী খণ্ডন করেছেন।*

(৩) রামমোহন বলেছেন বেদ নশ্বর। মোতাজেলারা বলতেন, কোরআন সৃষ্টবস্তু, স্রষ্টার মতো চিরন্তন নয়। প্রধানতঃ এই মতের জন্য মোতাজেলারা সর্ব্বসাধারণ মুসলমানের বিরাগভাজন হন।

তবে মোতাজেলাদের সঙ্গে রামমোহনের বড় পার্থক্য হয়ত এই—মোতাজেলারা সাধারণতঃ বিচারপন্থী পণ্ডিত, রামমোহনের পাণ্ডিত্য অনন্যসাধারণ, কিন্তু বিচারপন্থী পণ্ডিত তিনি যতখানি তার চাইতে বেশী তিনি বিচারপন্থী কর্ম্মী,—স্বদেশ-প্রেমিক ও মানব-প্রেমিক।

মুসলমান নৈয়ায়িকদের কাছে রামমোহন যে বিশেষভাবে ঋণী সে কথা সবাই স্বীকার করেছেন। তাঁদের আবিষ্কৃত তর্ক বিজ্ঞানের 'যথেষ্ট হেতু'-বাদ "তর্‌জি বেলা মুরাজ্জেহ্‌" (Principle of sufficient reason) আধুনিক বিজ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

রামমোহন মুস্‌লিম সাধনাকে যে-দৃষ্টিতে দেখেছিলেন সেই দৃষ্টি তাঁর সমকালে কোনো কোনো মুসলমানের ভিতরে ছিল কি না, তার পরিচয় পাওয়া যায় না। শুধু তাঁর জীবন-চরিতে পাওয়া যাচ্ছে, মুসলমানরা তাঁর কোনো কোনো মন্তব্যের জন্য এক সময়ে বিরক্ত

হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কলিকাতা-বাসকালে মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা জন্মেছিল। এমন কি মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব বেশী ছিল বলেই তাঁর স্বসম্প্রদায়ের লোক তাঁর উপর বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট ছিলেন,—তাঁরা সন্দেহ করতেন, হয়ত মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর পানভোজনও চলে। তৎকালের উচ্চশ্রেণীর মুসলমান রাজকর্ম্মচারীরা যে কৃতবিদ্য ও দক্ষ ছিলেন, বিদ্যায় বুদ্ধিতে চরিত্রবলে শারীরিক বীর্য্যে পোষাকে-পরিচ্ছদে তৎকালের মুসলমান যে তৎকালের হিন্দুর চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, বিলাতে সাক্ষ্যদান-কালে স্পষ্টভাবেই তিনি সে কথা বলেছিলেন।

কিন্তু তবু মনে হয়, মুসলমানদের সঙ্গে তাঁর এই যে সম্প্রাতি, সম-মতের সম্প্রীতি এ নয় সম-বৈদগ্ধ্যের এ সম্প্রাতি। মুস্‌লিম সাধনা ও তৎকালের মুস্‌লিম-প্রকর্ষ তাঁর প্রিয় ছিল, কিন্তু এ-সবের প্রতি তাঁর মোহ ছিল না। তাই পার্শীর পরিবর্ত্তে ইংরেজিকে রাজভাষা করবার পরামর্শ তিনি শাসকদের দিয়েছিলেন; উদ্দেশ্য, এর ফলে দেশের জনসাধারণ বিচারালয়ে কিছু সুবিচার পাবে, আর দেশবাসীর পক্ষে ইয়োরোপীয় বিদ্যালাভের পথ সুগম হবে।

## রামমোহন ও হিন্দু সাধনা

পাটনা থেকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে পিতার সঙ্গে রামমোহনের মতান্তর ঘটে। তার ফলে তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করেন ও তিব্বতে গমন করেন। তিব্বতে গমনের বাসনা হয়ত পাটনা-বাস-কালেই তাঁর হয়েছিল, তাতে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সম্ভাবনা ছিল, পার্ব্বত্য জাতিদের বিচিত্র পূজা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয়-লাভও তাঁর

অবাঞ্ছিত ছিল না। এই ভাবে নরপূজা পিশাচ-পূজা ইত্যাদি বিচিত্র অজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হয়েই নিরাকার একেশ্বরবাদের দিকে তাঁর অত প্রবণতা জন্মেছিল মনে হয়।

তিব্বত প্রভৃতি ভ্রমণের পরে তাঁর জীবনের বড় ঘটনা হচ্ছে কিছুকাল কাশীবাস ও হিন্দুশাস্ত্রের চর্চ্চা। এই চর্চ্চা তিনি যে গভীরভাবে করেছিলেন পণ্ডিতেরা সে-কথা স্বীকার করেন। আর রামমোহন যত শাস্ত্রের চর্চ্চা করেছিলেন তার মধ্যে হিন্দু-শাস্ত্রের চর্চ্চাই এ পর্য্যন্ত বেশী ফলপ্রসূ হয়েছে। হিন্দু-সমাজও তাঁকে আশানুরূপভাবে গ্রহণ করেন নাই. তবু তাঁরাই যে তাঁকে বেশী গ্রহণ করেছেন এ সত্য।

নগেন্দ্র-চট্টোপাধ্যায়-কৃত রামমোহন-চরিতকথায় তাঁর হিন্দুশাস্ত্রের চর্চ্চা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। বেদান্তের শাঙ্করভাষ্য অবলম্বন করলেও রামমোহন জোর দিয়েছেন ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্যজীবনের উপরে, আর শঙ্করাচার্য্য জোর দিয়েছেন সন্ন্যাসের উপরে, এসব কথা বলা হয়েছে। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রামমোহনের ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে পূর্ণ অদ্বৈতবাদ না বলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অথবা দ্বৈতবাদ বলতে চান। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর রাধাকৃষ্ণন শঙ্করদর্শনের যে-ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে মনে হয়, হিন্দু-মনীষার এই শ্রেষ্ঠ উপার্জ্জন অদ্বৈতবাদ রামমোহন যে-ভাবে বুঝেছিলেন সেই ভাবেই তা বোঝা হয়ত সঙ্গত। যথা—Sankara does not assert an identity between God and the world but only denies the independence of the world..... If we raise question as to how the finite rises from out of the bosom of the infinite, Sankara says that it is an incomprehensible mystery, maya. We know there is the absolute reality, we know that there is the empirical world,

we know that the empirical world rests on the *absolute ; but the how of it is beyond our knowledge* .......*The greatest thinkers are those who* admit the mystery (of the relation of God to the world) and comfort themselves by the idea that the human mind is not omniscient. Sankara in the East and Bradley in the West adopt this wise attitude of agnosticism (Hindu view of life-Pp 66-68) অন্যত্র—No theory has ever asserted that life is a dream and all experienced events are illusions. One or two late followers of Sankara lend countenance to this hypothesis, but it cannot be regarded as representing the main tendency of Hindu thought. (p. 69).

রামমোহনের হিন্দু শাস্ত্রের বিচার তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের চিরবিস্ময়ের সামগ্রী। হিন্দুর অতলস্পর্শ অতীতের অন্তহীন শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করে' তিনি যে-ভাবে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ও লোকশ্রেয়ঃ-তত্ত্ব তাঁদের উপহার দিয়েছেন, সেটি যে কত বড় দান সে-সম্বন্ধে তাঁর স্বসম্প্রদায়ের সর্ব্বসাধারণ এ পর্য্যন্ত তেমন অবহিতচিত্ত হন নাই এইজন্য যে তাঁর সিদ্ধান্তকে তাঁরা হিন্দু-সাধনা সম্বন্ধে বাস্তবিকই একটি শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত বলে ভাবতে পারেন নাই। যে কারণেই হোক প্রতীক-উপাসনার সঙ্গে হিন্দু-সাধনা বহুকাল ধরে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত রয়েছে। এই প্রতীক-উপাসনাকে কোনো কোনো হিন্দু সাধক অপকৃষ্ট সাধনা জ্ঞান করেছেন ; কিন্তু এটি যে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ( অথবা জীবনের জন্য ) হানিকর এমন নির্ম্মম কথা রামমোহনের মতো এতখানি জোর দিয়ে আর কোনো হিন্দু-সাধক বলেছেন মনে হয় না। শ্রীযুক্ত

*ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের "ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা" গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে, রামমোহনের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে শিবনারায়ণী সম্প্রদায়* বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী ছিলেন; কিন্তু এ রকম প্রতীক-উপাসনার বিরোধী একেশ্বরবাদী-দল হিন্দু-সমাজে এত কম যে এঁদের গণনার ভিতরে না আনলেও চলে। প্রতীক-উপাসনার প্রতি এরূপ বিরূপতার জন্যই যে রামমোহন তাঁর সমকালে তাঁর স্বসম্প্রদায়ের দ্বারা তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হয়েছিলেন ও বর্ত্তমান কালেও অনেকখানি অবহেলিত হচ্ছেন এ সত্য। এর সঙ্গে তাঁর অপ্রিয় হবার আর একটি বড় কারণ হচ্ছে— তাঁর বেশভূষা হিন্দুর চিরপরিচিত চিরশ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীর বেশভূষা নয়। রামমোহন তাঁর বেশভূষা ও আহারাদি প্রবলভাবেই সমর্থন করেছেন, তিনি তাঁদের বোঝাতে চেয়েছেন—সুরুচিপূর্ণ বেশ মানুষের জন্য বাঞ্ছনীয়, আর মাংস-আহারাদির দ্বারা তাঁদের নষ্ট বীর্য্যের পুনরুদ্ধার হতে পারবে।

রামমোহনের হিন্দু-সাধনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হিন্দু-সম্প্রদায়ের শিক্ষিতদেরও তেমন শ্রদ্ধার বস্তু হয় নাই হিন্দু-সাধনা সম্বন্ধে পরমহংস রামকৃষ্ণের সিদ্ধান্তের ফলে। তাঁর সুবিখ্যাত বাণী "যত মত তত পথ" দেশের লোকদের অনেক বেশী স্বস্তি দিয়েছে রামমোহনের "লোকশ্রেয়ঃ ও বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত শাস্ত্র" এই মন্ত্র থেকে। আর "যত মত তত পথ" বাণীতে দেশের লোক শুধু স্বস্তিলাভই করে নাই, একালের কোনো কোনো শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল, যেমন ফরাসী ভাবুক রমঁ্যা রলঁ্যা ও ভারতের স্বনামধন্য মহাত্মা গান্ধী, এই বাণীকে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণী বলে' মত প্রকাশ করেছেন। এ সম্বন্ধে রমঁ্যা রলঁ্যার যুক্তি এই—I have never seen anything fresher or more potent in the religious spirit of all ages

*than this enfolding of all the Gods existing in humanity, of all the faces of truth, of the entire body of human Dreams, in the heart and the brain,* in the Paramahangsa's great love and Vivekananda's strong arms... . But you must not suppose that this immense diversity spells anarchy and confusion......Each note has its own part in the harmony. No series of notes must be suppressed, and polyphony reduced to unison with the excuse that your own part is most beautiful ! Play your own part perfectly and in time, but follow with your ear the concert of the other instruments united to your own......And this teaching condemns all spirit of propaganda, whether clerical or lay, that wishes to mould other brains on its own model (the model of its own God or of its own Non-god who is merely God in disguise.) এই সঙ্গে তিনি মহাত্মা গান্ধীরও অভিমত উদ্ধৃত করেছেন—My veneration for other faiths is the same as for my own faith. Consequently the thought of conversion is impossible......Our prayer for others ought never to be: "God, give them the light thou hast given to me !"—but: "God, give them all the light and truth they need for their highest development".

মানুষে মানুষে মৈত্রীকামী রলঁ্যা ও গান্ধী যে গভীর বেদনা থেকে এসব কথা বলেছেন তা বুঝতে পারা কষ্টসাধ্য নয়। রলঁ্যা স্পষ্টই বলেছেন—At this stage of human evolution wherein both blind and conscious forces are driving all natures to draw together for "co-operation or

death", it is absolutely essential that the human consciousness should be impregnated with it until this indispensable principle becomes an axiom: that every faith has an equal right to live, and that there is an equal duty incumbent upon every man to respect that which his neighbour respects—(Life and Gospel of Vivekananda-Pp 353-35). কিন্তু উদ্দেশ্য সাধু হলেই সব সময়ে যে কার্য্যসিদ্ধি হয় তা নয়। মানুষে মানুষে যে-মৈত্রীর কামনা করে' এই সব মনীষী এই ব্যবস্থা সমীচীন মনে করেছেন এর প্রবর্ত্তনের ফলে সেই মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কি না, অথবা মানুষের জন্য এই ব্যবস্থার সত্যকার প্রয়োজন আছে কি না, সে-সবও বিচার্য্য।

ধর্ম্ম যদি ললিতকলার মতো মুখ্যতঃ মানস ব্যাপার হতো তাহলে জগতের সমস্ত ধর্ম্মকে এমন পরম আদরে সঞ্জীবিত রাখবার চেষ্টা হতো মানুষের সভ্যতার এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু সাধারণতঃ জীবনে ও ললিতকলায় যে প্রভেদ, ধর্ম্মে ও ললিতকলায়ও সেই প্রভেদ। ধর্ম্ম ও জীবনের অভেদত্বের কারণ, ধর্ম্ম একই-সঙ্গে জীবনের নিয়ামক ও জীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু ললিতকলাকে তেমনিভাবে জীবনের নিয়ামক বলা যায় না। জীবন অস্থির অপূর্ণাঙ্গ ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল; ললিতকলা অচঞ্চল, পূর্ণাঙ্গ, সৌন্দর্য্য-লোকে অবিনশ্বর; জীবন সত্য, ললিতকলা স্বপ্ন। ধর্ম্ম কখনো কখনো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের অথবা ব্যক্তি-বিশেষের এমন মানস ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু সেটি স্বাভাবিক বা সাধারণ ব্যাপার নয়। স্বভাবতঃ ধর্ম্ম মানুষের মানস ব্যাপার যতখানি তার চাইতে বেশী সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপার। তাই সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে যেমন পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য অসম্ভব ও অসত্য, ধর্ম্মের

ব্যাপারেও তেম্‌নি নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্য অবাঞ্ছিত, তাতে ধর্ম্মের যে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য—মানুষের বৃহত্তর সমাজ-জীবনে কল্যাণের আয়োজন—তাইই ব্যাহত হয়। মানুষের বয়স কম হয় নাই, অভিজ্ঞতাও কম হয় নাই। সেই অভিজ্ঞতার ফলে আজ এ কথা সে বুঝেছে যে জ্ঞান ও সত্যের অভিমানের মতো বিড়ম্বনা আর নাই। কিন্তু এই নূতন জ্ঞান লাভ করে' সে যদি ধর্ম্মে ধর্ম্মে Laissez-faire নীতি অবলম্বন করে তা'হলেও কম ভুল সে করবে না। জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের চিত্ত বিকশিত হয়। তার কর্ম্মজীবনও বিকশিত হয়। এই ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়েই বিরাট জগতের সাহচর্য্য যে তার লাভ হয়, সেটি তার জন্য অমূল্য। রলঁ্যা ও গান্ধীর এই নূতন ব্যবস্থার যে শান্তি ও স্বস্তি, লোক-সমাজে সতেজ ও সন্ধান-তৎপর মানসিকতা সৃষ্টির সহায়ক না হবার সম্ভাবনাই তার বেশী।

হয়ত বলা হবে, অন্ততঃ বিভিন্ন জাতীয় বা কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা ত চাইই, নইলে মানুষ পরস্পরকে চিন্‌বে ও বুঝবে কেমন করে'? এই চিন্তা-ধারার মূলেও রয়েছে একটি বড় ভুল—অতীত ও কতকাংশে বর্ত্তমানকে এ ক্ষেত্রে মনে করা হচ্ছে চিরকালের পরিচায়ক বলে'। অতীতে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন দুর্লঙ্ঘ্য ভৌগলিক ক্ষেত্রে লালিত হয়েছিল। কতকটা সেই ব্যবধানের প্রভাবে তাদের স্বাতন্ত্র্য হতে পেরেছিল সুস্পষ্ট। কিন্তু আজ সে-ব্যবধান চূর্ণ হবার পথে দাঁড়িয়েছে, মানুষের কৌতূহলও বর্দ্ধিত হয়ে চলেছে, জাতিতে জাতিতে আন্তর ও বাহ্য স্বাতন্ত্র্য তাই পরস্পরের অজ্ঞাতসারেও নিশ্চিহ্ন হবার পথে চলেছে। মানব-সভ্যতার এই এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও যদি বিভিন্ন জাতি বা সম্প্রদায়ের চিরস্থায়ী বৈশিষ্ট্য বা type-এর কথাই ভাবা

হয়, তাহলে ভাবনার পরিচয় যা দেওয়া হয় তার চাইতে বেশী পরিচয় দেওয়া হয় অতীত-প্রীতির। কোনো কোনো চিন্তাশীল ভবিষ্যৎ মানব-সমাজের একাকারত্বের কথা ভেবে আনন্দ পান না এই ধারণা থেকে যে তেমন একাকারত্ব হবে বর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন, সুতরাং অসুন্দর। কিন্তু কত অনাবশ্যক ও অর্থহীন বৈশিষ্ট্যের শৃঙ্খলে এখনো মানুষ বন্দী, এখনো কত অবিকশিত তার সৃষ্টিশক্তি, এ চিন্তা মনে স্থান দিতে পারলে সেই বর্ণ ও বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য্যের কথা ভেবেই তাঁরা আহ্লাদিত হবেন।

ধর্ম্ম জ্ঞানেরই প্রকার-ভেদ, এই কথাটি তেমন স্পষ্টভাবে মনে না রাখার ফলেই ধর্ম্ম-সমস্যা মানুষের জন্য এমন অশোভন ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যুগে যুগে ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের, অন্য কথায়, প্রত্যয়ীভূত জ্ঞানেরও, উৎকর্ষলাভ হয়েছে। একালে ধর্ম্মের উপরে বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির প্রভাবও সেই একই সত্যের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করছে। জীবনের অন্যান্য ব্যাপারে যেমন অপ্রতিহত সন্ধানপরতা ও কল্যাণের আয়োজন ভিন্ন আর কোনো দিকে লক্ষ্য রাখলে শেষ পর্য্যন্ত বিড়ম্বিতই হতে হয়, ধর্ম্মের ব্যাপারেও তেমনি সত্য ও কল্যাণ-জিজ্ঞাসাকে কিছুমাত্র শিথিল করবার প্রয়োজন আছে তা মনে হয় না। রামকৃষ্ণ ও গান্ধীর কর্ম্ম-জীবনের দিকে চাইলে দেখা যায় তাঁরাও যথাসম্ভব অভিমান-বিবর্জ্জিত হয়ে তাঁদের আবিষ্কৃত সত্যপথ অনুসরণ করে চলেছেন, তাতে অন্যের অন্তরে কতখানি বেদনা বাজ্‌লো সেটি তাঁদের চিন্তার মুখ্য বিষয় নয়।

তাই মনে হয় মানব-সভ্যতার নব সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পেরে রামমোহন যে তাঁর দেশবাসীকে অতীত বা বর্ত্তমান-প্রীতির পরিবর্ত্তে

লোকশ্রেয়ঃ ও বিচারবুদ্ধির মন্ত্র দান করেছিলেন, সে-মন্ত্রের যথাযোগ্য সমাদর হয় নাই সেই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত কোনো ক্রটির জন্য নয়—তাঁর দেশবাসীর সত্যপ্রীতির ও বৃহত্তর দেশের কল্যাণ-কামনার অভাবের জন্যই।

রামমোহনের হিন্দুশাস্ত্র-বিচারে এত চমৎকারিত্ব রয়েছে, পাণ্ডিত্য ও বিচার-বুদ্ধির এমন স্ফুরণ সেখানে হয়েছে যে সে-সম্বন্ধে আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর তেমন কৌতূহল না থাকা তার মনন-শক্তির উৎকর্ষের পরিচায়ক হয়ত নয়। এই সব বিচারে তাঁর কোনো কোনো শাস্ত্র-ব্যাখ্যা খুবই নূতন, যেমন গীতার এই সুবিখ্যাত শ্লোকের ব্যাখ্যা—

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

গীতার গান্ধীভাষ্যে এর অর্থ লেখা হয়েছে এই :—"কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তির বুদ্ধিকে জ্ঞানী যেন ওলট্ পালট্ না করে, বরঞ্চ সমত্ব রক্ষাপূর্ব্বক ভাল রকমে ভাল করিয়া তাহাকে যেন সর্ব্ব কর্ম্মে প্রেরণা দেয়।"—এইটি এর প্রচলিত ব্যাখ্যা, আর এই ব্যাখ্যার দ্বারা প্রচলিত আচারপদ্ধতি মান্য করতে বলা হয়। কিন্তু রামমোহন এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই :—"জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আপনি কর্ম্ম করিয়া অজ্ঞানী কর্ম্ম-সঙ্গিকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তক হইবেন, যেহেতু জ্ঞানির নিষ্কাম কর্ম্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও সেই প্রকার কর্ম্ম করিবেক। সুতরাং জ্ঞানির কদাপি কাম্য কর্ম্মে অধিকার নাই তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্ম দেখিয়া অজ্ঞানীও চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্ম করিবেক। কর্ম্ম-সঙ্গিদের কি প্রকার কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা ভূরি স্থানে ঐ গীতাতে লিখিয়াছেন। কর্ম্মাণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।……যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ॥ পরমেশ্বরের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অর্থাৎ ফল কামনা করিয়া কর্ম্ম করিলে

সে কর্ম্ম দ্বারা লোক বন্ধন প্রাপ্ত হয়। এবং স্মার্ত্তধৃত ষষ্ঠ স্কন্ধ বচন॥ ...“স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্মহি। ন রাতি রোগিণে পথ্যম্ বাঞ্ছতেপি ভিষকতমঃ॥ আপনি জ্ঞানবান্ ব্যক্তি অজ্ঞানকে সকাম কর্ম্ম করিতে উপদেশ করেন না, যেমন রোগী মনুষ্য কুপথ্য প্রার্থনা করিলেও উত্তম বৈদ্য কুপথ্য দেন না।” ( গ্রন্থাবলী—পৃষ্ঠা ২১৫ )।

## রামমোহন ও খৃষ্টধর্ম্ম

রামমোহন তাঁর Precepts of Jesus—a guide to peace and happiness—এর ভূমিকায় বলেছেন, খৃষ্টের এই যে উপদেশ, অন্যের প্রতি তেমন আচরণ কর যেমন আচরণ তুমি প্রত্যাশা কর, মানুষের নৈতিক জীবন গঠনের সহায়ক এমন পূর্ণাঙ্গ উপদেশ তিনি আর কোনো ধর্ম্মগ্রন্থে পান নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র হিসাবে বাইবেলের স্থান তাই অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের চেয়ে উচ্চে তিনি নির্দ্দেশ করেছেন। কিন্তু তাঁর সেই বাইবেল ত্রিত্ববাদ, খৃষ্টের রক্তে পাপীর পরিত্রাণ, ইত্যাদি দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্ব-বিবর্জ্জিত বাইবেল। বলা বাহুল্য বাইবেলের এই ধরণের ভক্তের প্রতি বাইবেলের ভক্ত-সাধারণের সন্তুষ্ট হওয়া অসম্ভব। খৃষ্টান-সমাজের এই অসন্তোষের ফলেই বাইবেলের প্রকৃত শিক্ষা নির্ণয়ে তিনি দীর্ঘ তিন বৎসর কাল সুকঠোর পরিশ্রম করেন। তিনখানি সুবিস্তৃত গ্রীক-ও-হিব্রুবচন-কণ্টকিত Appeal to Christian Public তাঁর এই কঠোর পরিশ্রমের ফল। তাঁর এই পাণ্ডিত্য দর্শনে তৎকালীন খৃষ্টান-জগত চমকিত হয়েছিলেন।

আধুনিক খৃষ্টান-জগত তাঁর এই খৃষ্টানশাস্ত্র-বিচারের কি মূল্য দেন দুর্ভাগ্যক্রমে সে-বিষয়ে কিছু জানি না। কিন্তু তাঁর দেশবাসীর

কাছে এর মূল্য কম হওয়া উচিত নয়। তাঁর এই খৃষ্টানশাস্ত্র-বিচারের ভিতর দিয়ে এই কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে পরস্পরের প্রতি প্রেমপূর্ণ জীবনকেই তিনি কাম্যজীবন জ্ঞান করতেন।

## রামমোহনের সাধনা

রামমোহনের খৃষ্টান-শাস্ত্রের বিচারে দেখা যায়, তিনি নিজেকে খৃষ্ট-অনুবর্ত্তী বলে প্রচার করেছেন। তাঁর তুহ্ফাতুল্ মুওয়াহ্হিদীন গ্রন্থে কিন্তু দেখা যায়, তিনি "ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ" "প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ" এ-সবের কিছুই মানেন নাই। এজন্য তাঁর সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা প্রায় একমত যে প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন একান্ত যুক্তিবাদী, কিন্তু পরে তাঁর সেই শাস্ত্রনিরপেক্ষ স্বাধীন যুক্তিবাদ ধর্ম্মাশ্রিত যুক্তিবাদে পরিণত হয়েছিল ; আর মানুষের জন্য এই ধর্ম্মাশ্রিত যুক্তিবাদই তিনি কাম্য মনে করতেন।

কিন্তু রামমোহন সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত কিনা সে-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবার অবসর আছে। তাঁর হিন্দুশাস্ত্রের বিচারেও দেখা যায়, তিনি নিজেকে শাস্ত্রানুগামী হিন্দু বলে প্রচার করেছেন ও সেই ভাবে হিন্দুর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেদান্ত আশ্রয় করে হিন্দুর জন্য প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞান আহরণের চেষ্টা করেছেন। অথচ তাঁর দেশবাসীর জন্য ইয়োরোপীয় জ্ঞানলাভের পথ সুগম করবার অনুরোধ জানিয়ে লর্ড আমহার্ষ্টকে তিনি যে পত্র লেখেন তাতে সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানলাভের দুরূহতার কথা বলেছেন, আর বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায় প্রভৃতির শিক্ষাকে বেশ উপহাস করেছেন। বলা যেতে পারে, বেদান্ত মীমাংসা ন্যায় প্রভৃতির প্রচলিত ব্যাখ্যাকে তিনি উপহাস করেছেন, প্রকৃত বেদান্ত মীমাংসা ও ন্যায়কে নয় ; তা'হলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত মধ্যযুগীয় জ্ঞানচর্চ্চার চাইতে ইয়োরোপীয়

বিজ্ঞান-দর্শন-চর্চ্চাকে তিনি বেশী মর্য্যাদা দিয়েছেন। বাইবেলের প্রতি তাঁর কিছু বেশী শ্রদ্ধা থাকলেও এর আলোচনা-কালেও তাঁর যুক্তিবাদ বাস্তবিকই যে শিথিল হয় নাই তার প্রমাণস্বরূপ এই কয়েকটি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে :—প্রথমত—Precepts of Jesus —a guide to peace and happiness গ্রন্থখানি তিনি বাইবেল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে এই দুর্জ্ঞেয়-তত্ত্ব-বিবর্জ্জিত সহজ সরল উপদেশ-মালায় বিশ্ব-বিধাতা সম্বন্ধে মানুষের ধারণা উন্নততর হবে ও তাদের একের অন্যের প্রতি ও সমাজের প্রতি ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রিত হবে; তাঁর তুহ্‌ফাতুল মুওয়াহ্‌হিদীন গ্রন্থে বিচার-বুদ্ধির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধেও তিনি এই ধরণের কথা বলেছেন, যথা,—সব ধর্ম্ম আত্মা ও পরকালে বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত; যদিও এই দুয়ের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় তবু এতে বিশ্বাস তেমন দোষার্হ নয় কেননা মানুষ দুষ্কর্ম্ম থেকে নিরস্ত থাকে পরলোকের ভয়ে ও রাজভয়ে। কিন্তু এই দুই প্রয়োজনীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে পান-আহার পবিত্রতা-অপবিত্রতা শুভ-অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে কত শত অকল্যাণকর ও বুদ্ধিনাশকর বিশ্বাস সম্মিলিত হয়েছে, ও তাতে মানুষের দুঃখ বেড়ে গেছে! তবু মানুষের অন্তরে এই শক্তি নিহিত আছে যে এই সব বিশ্বাস সত্ত্বেও সে যদি নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন জাতির ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়, তাহলে কি সত্য আর কিইবা অসত্য, তা সে নিরূপণ করতে পারবে আশা করা যায়; ও এইভাবে অর্থহীন ধর্ম্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে এক অদ্বিতীয় মঙ্গলবিধাতার প্রতি ও সমাজ-কল্যাণের প্রতি মনোযোগী হতে পারবে। দ্বিতীয়ত—রামমোহনের প্রতিপক্ষ এই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, খৃষ্টধর্ম্মের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বসমূহে বিশ্বাসী না হলে প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসী হওয়া যায় না; রামমোহন দেখিয়েছিলেন, খৃষ্টের

ভিতরে যা কিছু অলৌকিক বা অসাধারণ সব ঈশ্বর-প্রসাদে, তাঁর একান্ত নির্ভর ঈশ্বরের উপরে, আর বাইবেল থেকেই প্রমাণ করা যায় যে ঈশ্বরের সমস্ত আদেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের পরস্পরের প্রতি কি কর্ত্তব্য তাই শিক্ষা দেওয়া। ( Works-P. 553 )

তাই আমাদের বলতে ইচ্ছা হয়, তুহ্‌ফাতুল্‌ মুওয়াহ্‌হিদীন গ্রন্থে রামমোহন যে অলৌকিকতানিরপেক্ষ একেশ্বরতত্ত্বে ও লোকশ্রেয়বাদে উপনীত হয়েছিলেন পরে পরে এই মতের কোনো বিশেষ পরিবর্ত্তন তাঁর ভিতরে ঘটে নাই। যাঁরা এই পরিবর্ত্তন দেখবার জন্য উৎকণ্ঠিত তাঁরা বোধ হয় এই অদ্ভুত ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন নাই যে, তুহ্‌ফাতুল্‌ মুওয়াহ্‌হিদীন গ্রন্থেও রামমোহন একদিকে যেমন প্রখরযুক্তিবাদী অন্যদিকে তেম্‌নি সহজভাবে ঈশ্বরানুরাগী ও মানব-কল্যাণকামী।

বিলাতগমনের পূর্ব্বে রামমোহন Unitarian খৃষ্টানদের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ও ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে গমনের পরে উভয় শ্রেণীর খৃষ্টানদের সঙ্গে তিনি আলাপ আলোচনা করেন ও উভয় দলেই তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু লাভ হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে কোনো কোনো ধর্ম্মযাজক মত প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি ত্রিত্ববাদের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হচ্ছিলেন এবং আরো কিছুকাল বেঁচে থাকলে ত্রিত্ববাদ পূর্ণভাবেই গ্রহণ করতেন। মিস্‌ কলেট-লিখিত জীবনীর সম্পাদক এসব কথা গণ্য করেন নাই। তবে তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন যে রামমোহনের ভিতরে ধর্ম্ম-ব্যাকুলতা চিরদিনই অত্যন্ত প্রবল ছিল; সেই ব্যাকুলতার বশে প্রথম জীবনে তিনি স্বাধীন যুক্তিবাদ গ্রহণ করেন ও পরবর্ত্তী জীবনে যুক্তিবাদের অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করে' "ধর্ম্মবিশ্বাসে"র দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এই মতের স্বপক্ষে তিনি এই প্রমাণটি দিয়েছেন :—রামমোহন তাঁ

সর্ব্বশেষ রচনায় উচ্চশ্রেণীর ইয়োরোপীয়দের ভারতে বসতিস্থাপন সমর্থন করেন। এই বসতিস্থাপনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু তর্ক তিনি উত্থাপন করেন, সে-সবের একটি এই—উচ্চশ্রেণীর ইয়োরোপীয়দের ভারতে বসতি-স্থাপনের ফলে ও তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ভারত-বাসীদের যথেষ্ট উন্নতির সম্ভাবনা; এই উন্নত ভারতবাসীরা ও ইয়োরোপীয়েরা সম্মিলিত হয়ে ব্রিটিশের সহিত সম্বন্ধ ছেদন করতেও পারেন; তাহলেও তাঁদের ভিতরে বাণিজ্য-সম্পর্ক থাক্‌বে ও এই নব-আলোকপ্রাপ্ত ভারতবর্ষ এশিয়ার শিক্ষাগুরু হবে। রামমোহনের মূল বক্তব্য এই :—Americans were driven to rebellion by misgovernment. ..... The mixed community of India, so long as they are treated liberally and governed in an enlightened manner, will feel no inclination to cut off its connection with England. ......yet if events should occur to effect a separation, still a friendly and highly advantageous commercial connection may be kept up between two free and Christian countries, united as they will then be by resemblance of language, religion and manners.—এখানে সম্পাদক মহাশয় এই যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে রামমোহন তাঁর দেশবাসীদের খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হবার কথা ভেবেছেন, এটি সুসিদ্ধান্ত বলে' গ্রহণ করা যায় না কয়েকটী কারণে। প্রথমতঃ—যে-সমস্ত গণ্যমান্য ইয়োরোপীয় ভারতবর্ষে বসতিস্থাপন করবেন তাঁরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ও ভারতের শ্রেষ্ঠ অধিবাসী হবেন, তাঁদের অধ্যুষিত ভারতবর্ষকে রামমোহন খৃষ্টান-ভারতবর্ষ বলতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ—তাঁর প্রিয় খৃষ্টান-নীতির ( Do unto others as you like to be done by ) দ্বারা প্রভাবান্বিত ভারতবর্ষকে

তিনি খৃষ্টান-ভারত বলতে পারেন। তৃতীয়তঃ—তাঁর দেশবাসীরা সোজাসুজি বিশুর উন্নততর ধর্ম্মে দীক্ষিত হবে এ চিন্তা রামমোহনের জন্য একান্ত অপ্রীতিকর হয়ত ছিল না কেননা কোনো রকমে তাঁর দেশবাসীর ভালোর দিকে একটু পরিবর্ত্তন হোক এ কামনা তিনি করতেন, তবু এই চিন্তা যে তাঁর খুব প্রীতিকরও ছিল না তা বুঝতে পারা যায় আমেরিকার Bishop Ware-কে লিখিত তাঁর এই পত্রাংশ থেকে—I am led to believe from reason, what is set forth in the scripture, that "in every nation he that feareth God and worketh righteousness is accepted with him," in whatever form of worship he may have been taught to glorify God.—Bishop Ware-কে লিখিত এই পত্রে আরো একটি লক্ষ্য করবার কথা আছে। রামমোহনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ভারতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রসারের সম্ভাবনা কিরূপ ; তাতে তিনি শেষ পর্য্যন্ত এই উত্তর দেন :—বিজ্ঞান ইংরেজি সাহিত্য ও ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ সুনীতি শিক্ষার আয়োজন যদি এ-দেশবাসীর জন্য তাঁরা করতে পারেন তবে সেই ভাবেই তাঁরা এ-দেশবাসীর মনকে খৃষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণের উপযুক্ত করতে পারেন।

এই থেকে রামমোহনের সংস্কার-চেষ্টার অথবা সমগ্র সাধনার স্বরূপ জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হবার প্রয়োজন হয়। এই সম্পর্কে তাঁর সাধনার দুইজন শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী, রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ, যে মত প্রকাশ করেছেন তার মর্য্যাদা নিরূপণ প্রথমেই কর্ত্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিশ্বমানবের একত্ববোধ তাঁর সমকালে জগতে আর কারো ভিতরে এমন পূর্ণভাবে দেখা যায় না। বর্ত্তমান জগৎ সহযোগিতার জগৎ, স্বদেশের প্রাচীন সাধনার অবিনশ্বর যা-কিছু তা আয়ত্ত করে' অন্যান্য সাধনার দিকে তিনি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত

করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সকল কথার প্রমাণ রামমোহনের বিরাট সাধনার ভিতরে নিশ্চয়ই আছে—যদিও রামমোহনের সমকালে শুধু তাঁকেই বিশ্বমানবের একত্ববোধের পূর্ণ অধিকারী বলে ভাবতে আমাদের কিছু আপত্তি, কেননা রামমোহনের সমকালে, অথবা কিছু পূর্ব্বে, মহামনীষী গ্যেটের আবির্ভাব। নবযৌবনেই তিনি নিজেকে বলেছিলেন Worldling ( বিশ্বসন্তান ) ; আর পরিণত বয়সে তাঁর বিশ্বমানবতার পরিপূর্ণ বোধ সুবিদিত। তবু যিনি দূর স্পেনের জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার-লাভে উল্লসিত হয়ে নিজ ব্যয়ে এক বড় উৎসবের আয়োজন করেছিলেন, ও Naples-এর পরাধীনতা-দুঃখের অবসান হয় নাই জানতে পেরে জগতের অত্যাচারীদের উদ্দেশে এই অভিসম্পাত উচ্চারণ করেছিলেন—I consider the cause of the Neapolitans as my own and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been, and never will be, ultimately successful—মানুষের সঙ্গে তাঁর এই সহজ যোগ জাতিতে জাতিতে সহযোগিতার যোগের চাইতে নিবিড়তর বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

রামমোহনের সাধনার স্বরূপ-নির্দ্দেশ সম্পর্কে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের মন্তব্য পরম হৃদয়গ্রাহী, কল্পনার সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ। তিনি রামমোহনকে দাঁড় করিয়েছেন জগতের বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মর্ম্মোদ্‌ঘাটক রূপে। তাঁর মতে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সভ্যতা হচ্ছে বিশ্বজনীনতার এক একটি রূপ, এর কোনোটি মিথ্যা নয়, কিন্তু প্রত্যেকটির লক্ষ্য হওয়া উচিত তার সর্ব্বোচ্চ পরিণতির দিকে। বিভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলোচনা করে রামমোহন তাদের সেই সর্ব্বোচ্চ পরিণতির পথ সুগম করতে চেষ্টা করেছেন।—কিছু ভিন্ন বেশে এই চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের আগেই

পরিচয় হয়েছে। এই চিন্তাধারা দার্শনিক-প্রবর রাধাকৃষ্ণনের লেখনীতে রূপ পেয়েছে এই ভাবে—...If we believe that every type means something final, incarnating a unique possibility, to destroy a type will be to create a void in the scheme of the world (Hindu view of life). এই চিন্তাধারা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্যও নিবেদন করতে চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্ম্মের যে-রূপ সহজভাবে প্রতিদিন আমাদের সামনে উন্মুক্ত হচ্ছে সেই পরিচিত রূপের পানে এঁরা তাকান নাই, এঁদের আলোচিত ধর্ম্ম ভাবলোকের ব্যাপার—সেখানে কোনো Type-কে পূর্ণাঙ্গ ও অবিনশ্বর ভাব্‌লে আপত্তির কারণ তেমন ঘটে না।

এই সম্পর্কে আরো কয়েকটি কথা ভাববার আছে। আচার্য্য রাধাকৃষ্ণন প্রমুখ "স্বাতন্ত্র্য"-বাদী চিন্তাশীলেরা ভারতের জাতিভেদে দেখেছেন প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বা জাতির স্বাতন্ত্র্যরক্ষার একটি প্রয়াস। হয়ত তাঁদের এই অভিমতের মূলে সত্য আছে; কিন্তু এর ফল কি হয়েছে সেটিও বিচার্য্য। প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিচ্ছিন্নতা ভারতের পতনের এক বড় কারণ অনেক মনীষী এই মত ব্যক্ত করেছেন; তারপর এই বিচ্ছিন্ন বা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত অংশসমূহ যে কালে অসুন্দর বৈ সুন্দর হয় নাই তার পরিচয় পাওয়া যায় রামমোহনের সমসাময়িক ব্রাহ্মণ-সমাজের জীবনে—তাঁরা পূর্ব্বপুরুষের সাধনা বিস্মৃত হয়ে রামমোহনের উদ্ধৃত উপনিষৎ-বচনাবলী ভেবেছিলেন রামমোহনের নিজের রচিত শ্লোক বলে।—আর হিন্দু-সমাজের এই বিচ্ছিন্ন খণ্ডসমূহে শক্তি-তরঙ্গ খেলেছে তখন যখন দয়ানন্দ বা বিবেকানন্দের মতো স্বাতন্ত্র্য ধ্বংসকারীর আবির্ভাব সেখানে ঘটেছে।

স্বাতন্ত্র্য-বাদের বড় অপরাধ হয়ত এই যে এর প্রভাবে মানুষে মানুষে অপরিচয়ের, সুতরাং অপ্রেমের, সৃষ্টি হয়—সৃষ্টিধর্ম্মী কৌতূহল-

বৃত্তিরও খর্ব্বতা সাধন হয়। সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যলোপভীতির কোনো সার্থকতা হয়ত নাই;—পারশ্য সর্ব্বপ্রকারে আরবের বশ্যতা স্বীকার করেছিল কিন্তু জগতে পারশ্যের বিলোপ-সাধন হয় নাই; ব্যক্তিগত জীবনেও দেখা যায়, আমাদের মধুসূদন সর্ব্বপ্রকারে স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বাঙালীত্ব ও মানবত্ব কিছুই পরিম্লান হয় নাই—হয়ত বা উজ্জ্বলতর হয়েছে। রামমোহনকে বলা হয় প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষির যোগ্য বংশধর, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার প্রয়াস তিনি যা করেছেন তার চাইতে অনেক বেশী করেছেন স্বাতন্ত্র্য-ধ্বংসের ও সর্ব্ব-অভিমানশূন্য সত্যোপলব্ধির প্রয়াস।

বাস্তবিক, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ইত্যাদি প্রাচীন নামে রামমোহনকে পরিচিত করতে যাওয়া অসার্থক বলেই মনে হয়। তিনি ছিলেন সহজ ভাবে সত্যজিজ্ঞাসু,—আর জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা হয়ত এই সহজ পরিচয়েই পরিচিত।—কিন্তু এই সহজ সত্য-জিজ্ঞাসার প্রেরণায়ও মানুষ ধর্ম্ম-সংস্কারক সমাজ-সংস্কারক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি বহু-কিছু হতে পারেন, রামমোহন এর কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত? বলা বাহুল্য জীবন এক অখণ্ড ব্যাপার, তাই কোনো শক্তিমান একই সঙ্গে ধর্ম্ম-সংস্কারক সমাজ-সংস্কারক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হতে পারেন। তবু বিশেষ বিশেষ দিকে শক্তিমানদের প্রবণতা দেখা যায়—রামমোহনের প্রবণতা কোন্ দিকে?

ইতিহাসে রামমোহনের পরিচয় এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা রূপে, যদিও তিনি নিজে বার বার বলেছেন কোনো নূতন ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক তিনি নন। কিন্তু চিন্তাশীল-মাত্রই নূতন-কিছুর প্রবর্ত্তক, কেননা জগৎ চিরনূতন, কাজেই তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে এক নূতন মতের প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে। একালের অনেক শিক্ষিত বাঙালীর

অভিমত, রামমোহনকে ধার্ম্মিক পুরুষরূপে না দেখে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাশালী সমাজ-সংস্কারক রূপে দেখাই সঙ্গত, কেননা, তাঁদের মতে, ধর্ম্মভাবের যে মূল কথা বিশ্বাতীত কোনো শক্তিতে একান্ত আত্মসমর্পণ, সেই অহমিকাপরিশূন্য আত্মসমর্পণ তাঁর বিচিত্র বাদ-প্রতিবাদের ভিতরে দুর্লভ। কিন্তু এই অভিমত তেমন মূল্যবান নয় বলেই মনে হয়, কেননা রামমোহনের সমস্ত বাদ-প্রতিবাদের উৎস-স্বরূপ যে অবিচলিত মানব-কল্যাণ বোধ তার প্রতি এর দৃষ্টি নেই। রামমোহনের নিজের এই মন্তব্যটিও এই সম্পর্কে স্মরণীয়—"ধর্ম্ম যদি ঈশ্বরের, রাজনীতি তবে কি শয়তানের?"

যে-সম্প্রদায়ের তিনি নেতা তাকে বর্ত্তমানে একটি ভক্ত-সম্প্রদায় বলা চলে; কিন্তু ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে রামমোহনের নিজের ধারণা অনেক ব্যাপক, অভিনবত্বও তাতে কম নয়। প্রথমতঃ—একটি বিশেষ ধর্ম্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব উদ্‌ভাবনের দিকে তাঁর দৃষ্টি বেশ কম। সত্য বটে, তিনি এক নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনার কথা বলেছিলেন ও নাস্তিকতার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু এ সব বিষয়ে যে অনাবশ্যকভাবে ব্যস্ত তিনি ছিলেন না তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই দুইটি ব্যাপার থেকে:—হিন্দুসমাজের পৌত্তলিকতার তিনি বিরোধী হয়েছিলেন কেননা তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল—Hindu Idolatry, more than any other pagan worship, destroys the texture of Society (Introduction to the Vedanta); কিন্তু যখন তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা বলেছিলেন তাঁরা প্রকৃতই মূর্ত্তিপূজা করেন না, মূর্ত্তির ব্যপদেশে ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণের পূজা করেন, রামমোহন তাঁদের এই উক্তি যথার্থ বলে' স্বীকার করেন নাই, তবু বলেছিলেন, হিন্দু-সমাজের লোকেরা মূর্ত্তিপূজার যে এমন রূপক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেছেন এ শুভ লক্ষণ। আর

বিলাতে গমন করে' ত্রিত্ববাদী খৃষ্টানদের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশেছিলেন তার কারণ মনে হয় এরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস সত্ত্বেও তাঁদের সমগ্র জীবনের উৎকর্ষ। দ্বিতীয়তঃ—সুফীমত, যোগ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাচীন ধর্ম্মসাধন-প্রণালীকে তিনি ব্যবহার করেছিলেন দেহ ও মনের উৎকর্ষ বিধানের উপাদান রূপে। কিন্তু সেই উৎকর্ষ-সমন্বিত দেহ-মনের ব্যবহার করেছিলেন জ্ঞানান্বেষণে ও মানব-সেবায়, অর্থাৎ, তাঁর চারপাশের লোকদের দৈনন্দিন জীবনের উন্নতি বিধানে। দেশের প্রাচীন অকল্যাণকর প্রথা-সমূহের বিলোপ-সাধন, উন্নততর শিক্ষাপদ্ধতির প্রচলন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, অত্যাচারিত কৃষকদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান, দেশের সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্নততর বিচার-ব্যবস্থার প্রচলন, ইত্যাদি বিষয়ে রামমোহনের অশেষ প্রয়াসের কথা সুবিদিত। শুধু দুঃখ এই, এই প্রাণপ্রদ চিরন্তন ধর্ম্ম—ভাগ্যবান্ জাতির লোকেরা যার মর্য্যাদা উপলব্ধি করতে প্রায়ই ভুল করেন নাই—আমাদের দেশের ভাবুক ও কর্ম্মীদের যথাযোগ্য অনুধাবনের বিষয় হয়েছে এ কদাচিৎ।

গ্যেটে সম্বন্ধে ক্রোচে বলেছেন, অল্প বয়সেই তাঁর চিত্তের আশ্চর্য্য বিকাশ-সাধন হয়েছিল, আর আমৃত্যু তা অক্ষুণ্ণ ছিল। রামমোহন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তাঁর যৌবনের তুহ্ফাতুল্ মুওয়াহ্হিদীন গ্রন্থেই তাঁর মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকাশ দেখ্তে পাওয়া যায়। তাঁর বিভিন্ন ধর্ম্মের আলোচনাকে গণ্য করা যেতে পারে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে সমস্ত বক্রতা থেকে উদ্ধার করে' ঋজু করবার প্রয়াস রূপে। "তুহ্ফাতুল্ মুওয়াহ্হিদীন"-এর মস্তিষ্ক ও বিভিন্ন জনহিত-প্রচেষ্টার মানব-প্রেম ও কর্ম্মশক্তি—রামমোহনের প্রতিভার মর্য্যাদা এ-সব ক্ষেত্রে অন্বেষণ না করলে তাঁর প্রতি অবিচার করার সম্ভাবনাই বেশী।

রামমোহন শতবার্ষিকী—ঢাকা

# পথ ও পাথেয়

কিছুদিন আগে স্বনামধন্য উর্দ্দু-কবি ইকবালের কাব্যের আলোচনায় কয়েকদিন কাটাবার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাঁর পার্শীতে লেখা আস্‌রার-ই-খুদি-র ইংরেজী অনুবাদ বহু পূর্ব্বেই পড়েছিলাম। এবার তাঁর উর্দ্দু রচনার সঙ্গে আরো একটু পরিচয়ের ফলে বোঝা গেল ইকবালের প্রতিভা মুস্‌লিম ভারতে, হয়ত বা মুস্‌লিম জগতে, এক বিশেষ অর্থপূর্ণ প্রতিভা। ভারতীয় মুসলমানদের কথাই প্রধানতঃ আমাদের আলোচনার বিষয়। কিছুদিন থেকে এই ভারতীয় মুস্‌লিম নবপ্রতিষ্ঠালাভের পথ ও পাথেয়ের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে ফিরছে—সেই ব্যাকুল সন্ধানীদের সামনে ইকবাল দাঁড়িয়েছেন নেতৃত্বের দাবী নিয়ে। তাঁর সেই দাবী উপেক্ষিত হবার সম্ভাবনা নেই বল্লেই চলে। শিক্ষিত ভারতীয় মুসলমানদের ভিতরে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছেন তাঁরা বড়-জোর ভাবুকতার দিনমজুরী করছেন;—তাই তাঁদের চাইতে সূক্ষ্মতরদৃষ্টিসম্পন্ন, সুপণ্ডিত, সর্ব্বোপরি অনুপমবাক্‌-শক্তিশালী ইকবাল যে অচিরে তাঁদের সবারই অন্তরে সম্ভ্রমের আসন লাভ করবেন তা স্বাভাবিক।

কিন্তু ইকবাল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে একথা ভুললে তাঁর প্রতিভার অবমাননা করা হবে যে তিনি কবি। তাঁর চিন্তা-ভাবনার মূল্য যাই থাকুক তাঁর শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা তাঁর কবিত্বের জন্য। উর্দ্দু কবিগণ স্বভাবতঃ রচনানিপুণ ও সৌন্দর্য্যরসিক। ইকবালের প্রতিভায় সেই সঙ্গে মিশেছে দার্শনিকতা ও এক অদ্ভুত জ্বালা-বোধ।

কিন্তু কবি-ইকবাল আজ আমাদের আলোচনার বিষয় নন, আজ আমাদের আলোচনার বিষয় মুস্‌লিম-নেতা ইকবাল। এ ব্যাপারে

বিশেষ সাহায্য পাওয়া যাবে তাঁর এই ক'খানি কাব্য থেকে—আস্‌রার-ই-খুদি, শেকোয়া, ও জওয়াব-ই-শেকোয়া। আস্‌রার-ই-খুদি বা 'আত্মতত্ত্ব'-এ (Secrets of the Self) পাওয়া যাবে তাঁর চিন্তার দার্শনিক ভিত্তি, শেকোয়া বা 'অনুযোগ'-এ পাওয়া যাবে তাঁর অঙ্কিত মুসলমানের পতনের ছবি ও তার জন্য তাঁর নিদারুণ ক্ষোভ, * আর জওয়াব-ই-শেকোয়া বা 'অনুযোগের প্রত্যুত্তর'-এ পাওয়া যাবে মুস্‌লিম-জাগরণ সম্পর্কে তাঁর পথ-নির্দ্দেশ।

আস্‌রার-ই-খুদি-র ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় Dr. Nicholson বলেছেন, দার্শনিক নিট্‌শের প্রভাব ইকবালের উপরে পড়েছে। তা নিট্‌শের প্রভাবের ফলেই হোক অথবা অন্য কারণেই হোক ইকবাল শক্তিমত্তায় একান্ত বিশ্বাসী। তিনি বারবার বলেছেন—শক্তিমান হওয়াই জীবনের ধর্ম্ম, যে শক্তিমান হ'তে পারলে না সে জীবন নষ্ট করলে। † তাঁর এই শক্তি-বাদ সম্পর্কে তিনি অন্যত্র বলেছেন—দার্শনিক বার্গসঁর মতে পরিবর্ত্তন-প্রবাহে মানুষ ভেসে চলেছে; কিন্তু তাঁর ধারণা, এই পরিবর্ত্তন-প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতাও মানুষের আছে। কোরআনে ও মুস্‌লিম সাধকদের জীবনে এর এক অতি-বড়

* শেকোয়ার সূচনার দুটি লাইন এই :—

আয়্ খোদা! শেকোয়া-ই-আর্‌বাবে-ওফা ভি সুন্‌লে।
খুগারে-হাম্‌দ-সে থোড়াসা গেলা ভি সুন্‌লে॥
হে খোদা, একান্ত নতশিরদের অনুযোগও কিছু শোনো।
প্রশংসায় চির-অভ্যস্ত মুখ থেকে নিন্দাও কিঞ্চিৎ শোনো॥

† **In solidity consists the glory of life,**
**Weakness is worthlessness and immaturity —**

*Secrets of the Self.*

পরিচয় তিনি পেয়েছেন। তাই তাঁর মতে মহাসাধনা ইস্‌লাম নিয়তির দাস নয়—বরং তার প্রভু।

একজন সাধারণ মুসলমানও বিশ্বাস করেন—ইস্‌লাম আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম্ম-ব্যবস্থা, আল্লাহ্‌র বাণী কোরআনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত; তাই ইস্‌লাম ও কোরআন অবিনশ্বর, অপরিবর্ত্তনীয়, চিরশক্তিমন্ত। এর সঙ্গে ইকবালের পার্থক্য এইটুকু যে এই বিশ্বাসই তাঁর পক্ষেও সব-চাইতে বড় কথা কি না সে-সম্বন্ধে কিছু না ব'লে তিনি ইস্‌লামের মহিমা প্রচারে ব্রতী হয়েছেন দার্শনিক যুক্তিতর্কের ও এক নিবিড় উপলব্ধির সাহায্যে।

এই জন্যই তাঁর কথার প্রভাব অনেক বেশী। আমাদের বাংলা দেশের জনৈক খ্যাতনামা 'আলেম' মুস্‌লিম তরুণদের কারো কারো সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার দিকে প্রবণতা দেখে ও 'আলেম'দের এসবের প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা লক্ষ্য ক'রে এই প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে ইস্‌লাম সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার বিরোধী নয়। এই ধরণের ব্যাখা দ্বারা ইস্‌লামের আধুনিকতা প্রতিপাদনের অন্য মূল্য যাই থাকুক এর খুব বড় ত্রুটি এইখানে যে এ-ব্যাখ্যায় সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার মাহাত্ম্য বাড়ে না, অপর পক্ষে জীবনের এক নিয়ামক আদর্শ হিসাবে ইস্‌লামের মূল্য ক্ষুণ্ণ হয়। এতে ইস্‌লামের অবস্থা হয় শক্তিহীন বৃদ্ধ পিতার মতো, শক্তিমান যুবক পুত্রের আচরণ সমর্থন না ক'রে যাঁর উপায় নাই। অপর পক্ষে ইকবালের যে-কথা—ইস্‌লামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ তার জীবনের সত্যকার স্বাদ পেতে পারে, সারা জগৎ সন্ধান ক'রে এ তিনি বুঝেছেন,—এতে ইস্‌লামকে দাঁড় করানো হয় এক সুমহৎ বিশ্ব-আদর্শ হিসাবেই, তার বর্ত্তমান দুর্ব্বলতা বা কার্য্যকারিতাই তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়স্থল হয় না।

কিন্তু যুক্তির সাহায্য যে ইকবাল বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন, অথবা করতে চেয়েছেন, এতেই বহু শ্রেণীর যুক্তিবাদীর আঘাতের স্থল তাঁকে হ'তে হয়েছে, আর এই যুদ্ধে কোনো প্রতিপক্ষের কাছে পরাজিত হ'লে পরম বিনয়ে হার স্বীকার না ক'রে তাঁর উপায় নাই। অন্যভাবে কথাটি বললে দাঁড়ায়—যুক্তির সাহায্যে ইস্‌লামের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে প্রকারান্তরে তিনি যুক্তিরই মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অর্থাৎ, যুক্তির আশ্রয় তিনি যখন নিয়েছেন তখন তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে যুক্তিতে যা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয় তাই-ই শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে Dr. Nicholson তাঁর অনূদিত Secrets of the Self-এর ভূমিকায় বলেছেন—

Iqbal's philosophy is religious, but he does not treat philosophy as the handmaid of religion. Holding that the full development of the individual presupposes a society, he finds the ideal society in what he considers to be the Prophet's conception of Islam.

ইকবালের মতবাদ এইবার একটু বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

বলা হয়েছে তিনি শক্তিমত্তায় বিশ্বাসী—নিজের শক্তিতে যে বিকশিত হয়ে উঠতে পারলে না, তাঁর মতে, সে কৃপার পাত্র। এই শক্তির বাণী প্রচার ক'রে একদিকে যেমন পতিত মুসলমানের কানে জড়তা বিসর্জ্জনের মন্ত্র দেওয়া হলো, অন্যদিকে তেম্‌নি তার কল্পনা উদ্দীপ্ত করা হলো, তার অবসন্ন শিরায় শিরায় এক নূতন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে গেল,—মুহূর্ত্তের জন্য জীবনের এক মহাসার্থকতার দ্বার তার জন্য উন্মুক্ত হলো!

এম্‌নিতর অনুভূতির পরক্ষণে এ-প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক—এই সার্থকতা লাভ হবে কোন্ পথে ?

মানুষের মুখে এ বড় নিষ্ঠুর প্রশ্ন। কিন্তু নেতারা এ প্রশ্নের উত্তর দেন—ইক্‌বালও দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন—মুসলমানের পতনের কারণ, সে ইস্‌লাম ছেড়ে দিয়েছে ; তার পূর্ব্বপুরুষগণ বিশ্ববরেণ্য হয়েছিলেন ইস্‌লাম অবলম্বন ক'রে। এই কথাটি একটি ইংরেজী বক্তৃতায় খুব জোরালো ক'রে তিনি বলেছেন এই ভাবে—

In times of crises in their History it is not Muslims that saved Islam, on the contrary, it is Islam that saved Muslims.

এ-উত্তরে বুঝতে পারা যাচ্ছে ইস্‌লাম বলতে অনেকখানি সুস্পষ্ট এক আদর্শ তাঁর মনে আছে, তার মাহাত্ম্য তাঁর কাছে অপরিসীম। কিন্তু তাঁর এই উক্তির ত্রুটি এই যে তিনি এখানে প্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেছেন নূতন অর্থে। ইস্‌লাম ব'লতে তিনি বোঝেন শক্তিমত্তা, কিন্তু বহু প্রাচীন মুস্‌লিম মনীষী ইস্‌লাম ব'লতে বুঝেছেন আত্মসমর্পণ। কেউ কেউ ব'লতে পারেন, এ দু'য়ে আসল পার্থক্য হয়ত নেই। কিন্তু তা সত্য নয় এই জন্য যে শক্তি-বাদী ইকবাল বিশেষভাবে চাচ্ছেন মুসলমানের জন্য রাজনৈতিক গৌরব, কিন্তু সমর্পণ-ধর্ম্মী অনেক মুসলিম মনীষী ঠিক তাই-ই চান নাই।

তারপর ঐতিহাসিক ঘটনারও তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে-সম্বন্ধে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। তিনি বলেছেন, সঙ্কটকালে ইস্‌লাম মুসলমানকে উদ্ধার করেছে। একটি সুপরিচিত সঙ্কটকালের কথা ভাবা যাক—মোতাজেলা-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সর্ব্বসাধারণ মুসলমানের

সংঘর্ষ-কাল! ইস্‌লামের সেই সুপরিচিত সঙ্কটকালে ইমাম গাজ্জালি জয়ী হয়েছিলেন ও মোতাজেলা-নেতা ইবনে রোশ্‌দ (Averroes) পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ-জয় ইস্‌লাম ও মুসলমানের জন্য সত্যকার জয় হয়েছিল কিনা সে-সম্বন্ধে মুস্‌লিম চিন্তাশীলদের ভিতরেই প্রবল মতভেদ বিদ্যমান। এই সম্পর্কে এই ব্যাপারটির উল্লেখ হয়ত অসঙ্গত হবে না যে পরাজিত ইবনে রোশ্‌দের চিন্তার প্রভাব যাঁদের উপরে পড়েছিল তাঁদের সন্ততি বর্ত্তমান ইয়োরোপ, আর বিজেতা ইমাম গাজ্জালির চিন্তার প্রভাব যাঁদের উপরে পড়েছিল তাঁদের সন্ততি বর্ত্তমান মুস্‌লিম-জগৎ। বলা যেতে পারে—ইতিহাস শেষ হয়ে যায় নাই। তা সে-শেষ বিজেতা বিজিত কারো জন্যই হয় নাই।

উর্দ্দু-কাব্যরসিকরা এ বিষয়ে বোধ হয় একমত যে মুসলমানের পতনের জন্য বেদনা যাতে ব্যক্ত হয়েছে সেই শেকোয়া-র চাইতে তার প্রতিকারের কথা যাতে বলা হয়েছে সেই জওয়াব-ই-শেকোয়া কাব্য-হিসাবে নিকৃষ্টতর। এর থেকে দৃষ্টিমানরা সহজেই বুঝতে পারেন প্রতিকার সম্বন্ধে সুনিশ্চিত অকুণ্ঠিত বাণী উচ্চারণ করতে ইকবাল পারেন নাই—যদিও তার সন্ধানে তিনি ফিরছেন। কিন্তু তা না পারলেও তাঁর এই সব কথার প্রভাব কম না হওয়াই সম্ভবপর। তিনি যা বলছেন মুসলমান-সমাজে তাই-ই প্রচলিত মত, তার উপর এর সঙ্গে তাঁর সংস্রব এ'কে নূতন শক্তি দিয়েছে।

ইকবালের রচনায় দার্শনিকতা থাকলেও আসলে তিনি কবি—ইস্‌লাম বলতে এক নূতন সৌন্দর্য্যচ্ছবি * তাঁর মনোনেত্রে আবির্ভূত হয়েছে, তার মাহাত্ম্যে তিনি একান্ত বিশ্বাসবান।

* কবিদের উদ্দেশ্যে গ্যেটে এই একটি সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেছেন :—যখন হৃদয় মন উধাও হয়ে ওঠে তখন, হে তরুণ, মনে রেখো কল্পনাদেবী (Muse) সঙ্গিনী হতে পারেন কিন্তু অভ্রান্ত পথনির্দ্দেশ তাঁর নয়।—Goethe by B. Croce, p. 4.

এই একান্ত বিশ্বাস অশ্রদ্ধার যোগ্য নয় বরং শ্রদ্ধেয়,—নূতন বিশ্বাসে মানুষ তার অন্তরে অন্তরে এক নিবিড় পুলক অনুভব করবে ও অপরকে সেই আনন্দ উপহার দেবে এর চাইতে ভাল কাজ সে আর কি করতে পারে! কিন্তু বিশ্বাসের প্রভাব মানুষের উপরে এ না হয়ে হয় অন্য রকমের—এর প্রভাবে মানুষ হয়ে ওঠে নিদারুণ অত্যাচারী। জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের ইতিহাস এই কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েছে—একালের জাতীয়ত্ববাদীরা নূতন ক'রে এই অভিশাপগ্রস্ত হয়েছেন। ইকবাল বলেছেন, ইস্‌লাম মানুষের জন্য "আবে হায়াত" মৃতসঞ্জীবনী, ডাঃ মুঞ্জে বা শ্রীঅরবিন্দ বলছেন, হিন্দুত্ব মানুষের জন্য অমোঘ বিধান;—এসব কথা মানুষ কখনো ধীরে-সুস্থে বুঝে দেখতে চেষ্টা করবে কিনা জানিনা, কিন্তু এর প্রভাবে ভারতবাসীর জীবন যে হয়ে উঠ্‌ল দুর্ব্বহ। মনীষী সাদী বলেছেন—সাধু উদ্দেশ্যের মিথ্যা অসাধু উদ্দেশ্যের সত্যের চাইতে ভাল; ইকবালের বা আধুনিক হিন্দু মনীষীদের ব্যাখ্যাত ইস্‌লাম-আদর্শ বা হিন্দুত্ব-আদর্শ যদি যুক্তিতর্কের দিক দিয়ে অভ্রান্তও হতো তবু সে-সবের এমন ভয়াবহ পরিণতি দেখে মানুষের জন্য সে-সবের উপযোগিতায় সন্দেহ প্রকাশ করা অসঙ্গত হতো না।

ইকবালের ইস্‌লাম-ব্যাখ্যার দুর্ব্বলতা কোথায় তা কিছু বুঝতে চেষ্টা করা হয়েছে। এর উৎপত্তি-সূত্র খুঁজলেও বুঝতে পারা যাবে এর দুর্ব্বলতা—আধুনিক জগতে মুসলমান এক পতিত সম্প্রদায় অথচ এ জ্ঞান তাঁদের আছে যে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ জগজ্জয়ী হয়েছিলেন,—রুগ্‌ণের পক্ষে উত্তেজনা অকল্যাণকর।

কিন্তু যুক্তিতর্কের দিক দিয়ে কোনো মতবাদ দুর্ব্বল হ'লেও মানুষের জীবনের উপর তার প্রভাব প্রবল হ'তে বাধ্‌তে না-ও পারে,

বিশেষতঃ ইকবালের বাণীতে যখন রয়েছে প্রত্যয়ের তেজ ও এক অনুপম সৌন্দর্য্যচ্ছটা।

ইকবালকে পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ না ক'রে ভারতীয় মুসলমান হয়ত পারবেন না যদি অন্য কোনো সবলতর বা সুন্দরতর চিন্তাধারা তাঁদের সামনে উন্মুক্ত না হয়।

ইকবালের চিন্তার চাইতে অন্য কোনো সবলতর বা সুন্দরতর চিন্তাধারা ভারতীয় মুসলমানদের সামনে আছে কি না বলা শক্ত। তবে এ কথা সত্য যে অন্য একটি চিন্তাধারাও কিছুদিন থেকে তাঁদের সামনে প্রবাহিত হচ্ছে। এ ধারা প্রবর্ত্তিত করেছেন মুস্তফা কামাল।

মুস্তফা কামালের সত্যকার অনুরাগী ভারতীয় মুস্‌লমানদের ভিতরে তেমন বেশী হয়ত নেই—অন্ততঃ 'আলেম'-সম্প্রদায়ের ও নেতা ও সম্পাদক-সম্প্রদায়ের কথাবার্ত্তা শুনে তাই-ই মনে হয়। তবে তরুণ মুস্‌লিম কামালের কর্ম্মচেষ্টার অর্থ পুরোপুরি না বুঝেও মোটের উপর হয়ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই তাঁর পানে চেয়ে আছেন। বাংলা দেশে এই দল নিজেদের আদর্শের নাম দিয়েছেন—বুদ্ধির মুক্তি।

ইকবালের ইস্‌লাম-আনুগত্যের আদর্শ আর মুস্‌লিম তরুণদের এই 'বুদ্ধির মুক্তি'র আদর্শ পরস্পর-বিরোধী মনে হ'তে পারে। এ দুয়ে খুব বড় পার্থক্যও আছে,—একের দৃষ্টি শাস্ত্রের পানে খুব বেশী, অপরের দৃষ্টিতে শাস্ত্র জীবনের বহু উপকরণের এক উপকরণ, একের ভিতরে রয়েছে একটি বিশেষ আদর্শের জন্য আকুলতা, অপরের ভিতরে আছে আত্মপ্রকাশের আনন্দ ও সহজ জগৎ-প্রীতি,—তবু এই দুয়ের ভিতরে এই বড় মিল রয়েছে যে দুই-ই যুক্তিপন্থী, দুয়েরই চরম লক্ষ্য সত্য ও জগতের কল্যাণ।

বাংলার মুস্‌লিম-সমাজে এই 'বুদ্ধির মুক্তি'-বাদীদের উদ্ভবের মূলে তিনটি বড় কারণ দেখতে পাওয়া যাবে:—প্রথমতঃ, ইসলামের সত্যকার সামাজিকরূপ বাংলার মুস্‌লিম-জীবনে নগণ্য অথচ এরও উপর ধর্ম্মের হুকুম প্রবল করতে চেষ্টা করা হয়েছে; দ্বিতীয়তঃ, বাংলা আত্মনিষ্ঠ ধর্ম্মসাধনার দেশ, আউল-বাউলের দেশ, ধর্ম্মসংহিতাদির প্রভাব এ-দেশের লোকদের জীবনে অল্প। শতাধিক বৎসর আগে চট্টগ্রামের জনৈক মুসলমান দরবেশ তাঁর 'জ্ঞান-সাগর' গ্রন্থে হজরত মোহম্মদের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

মোর পরে পয়গাম্বর না জন্মিব আর ॥
মোর পরে হইবেক কবি ঋষিগণ।
প্রভুর গোপন রত্নে বান্ধিবেক মন ॥
শাস্ত্র সব ত্যাগ করি ভাবে ডুম্ব দিআ।
প্রভুপ্রেমে প্রেম করি রহিবে জড়িআ ॥

বাংলার মুসলমান-বাউলদের রচনায় চিন্তার স্বাধীনতা খুবই লক্ষ্য-যোগ্য; তৃতীয়তঃ, বাংলাদেশের শিক্ষিত হিন্দু সমাজে শতাধিক বৎসর যাবৎ চিন্তায় ও কর্ম্মে বিশ্বধারার ঢেউ খেলে যাচ্ছে; তাতে বাংলার জাতীয় জীবনে আশানুরূপ ফল ফলেছে কিনা সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়েও বলা যায়, এ ঢেউ আজো যে প্রবল তার আধুনিকতম প্রমাণ শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন'। এ-ঢেউ যে বাংলার মুস্‌লিম সমাজের 'বুদ্ধির মুক্তি'-বাদীদেরও লাগ্‌বে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু এরও চাইতে বড় কারণ এই অভিনব মুস্‌লিম জাগরণের মন্ত্রের মূলে হয়ত আছে। আধুনিক তুর্ক যে ইয়োরোপের ইতিহাস থেকে নিজেদের কর্ম্মচেষ্টার নজির সংগ্রহ করছেন এ কথা অনেকেই বলেছেন, তার সঙ্গে একথাও কেউ কেউ বলেছেন যে এই ধরণের

কর্ম্মপ্রেরণার উৎস ইস্‌লামের নিজের ভিতরেই আছে। ইস্‌লাম দেবদেবীর মূর্ত্তি চূর্ণ করেছে, পৌরহিত্য রহিত করেছে, নরনারীনির্ব্বিশেষে ব্যক্তির স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে; কাণ্ডজ্ঞানের এই জয়যাত্রা শাস্ত্রের দুর্জ্জেয় মাহাত্ম্যের সামনে যুগের পর যুগ প্রতিহত হবে এ আশা করা সঙ্গত না-ও হ'তে পারে। ইকবাল নিজেই তাঁর নবপ্রকাশিত Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam গ্রন্থে এক জায়গায় বলেছেন—

The birth of Islam is ......the birth of inductive intellect. In Islam *prophecy reaches its perfection in discovering the need of its own abolition.* (p. 176)

এই 'বুদ্ধির মুক্তি'র জন্মবেদনা বারবার মুস্‌লিম-জগতে অনুভূত হয়েছে। পশ্চিমের আবু হানিফা ও মোতাজেলা-সম্প্রদায় ও পূর্ব্বের আকবর ও আবুল ফজল এর কিছু কিছু প্রমাণ।

তা উৎপত্তি-সূত্র যাই-ই হোক তার চাইতে বড় কথা এর অনুবর্ত্তীদের অন্তরে এর জন্য অনুরাগ ও সমসাময়িক জীবনের জন্য এর প্রয়োজন। এর অনুবর্ত্তীদের অন্তরে এ এক অভিনব স্বাচ্ছন্দ্য ও মুক্তির আনন্দ এনে দিয়েছে বুঝতে পারা যাচ্ছে, আর এর প্রয়োজন সুগভীর ব'লেই মনে হয়। আমরা গৃহে বাস করি সত্য কিন্তু সে-গৃহ নির্ম্মিত হয় আকাশের নীচে। বিভিন্ন জাতীয়ত্ব বা সাম্প্রদায়িকতাও তেম্‌নি মানুষের জন্য অসত্য নয়, কিন্তু সকলে মিলে মানুষ এক বিশ্ব-পরিবার, সেখানে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য রয়েছে, এই বৃহত্তর জীবনের কথা মানুষ যখন বিস্মৃত হয় তখনই আরম্ভ হয় তার দুর্দ্দিন। মুস্‌লিমত্বের অভিমান বা হিন্দুত্বের অভিমানের চাইতে বুদ্ধির মুক্তির আদর্শ যে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে

ভারতবাসীর জন্য পরম কল্যাণকর আদর্শ, একথা হয়ত নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

মুস্‌লিম জাগরণ সম্পর্কে ইকবালের যে-সব কথার আলোচনা আমরা করেছি সে-সব তাঁর আগেকার লেখা কাব্য থেকে নেওয়া। মনে হয় কিছু মত-পরিবর্ত্তন সম্প্রতি তাঁর হয়েছে। তাঁর পূর্ব্বোল্লিখিত Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam গ্রন্থে তুর্কীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহু সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করেও তিনি তা'র সংস্কার-চেষ্টা মোটের উপর শ্রদ্ধা ও আনন্দের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য—

If the Renaissance of Islam is a fact, and I believe it is a fact, we too one day, like the Turks, will have to revaluate our intellectual inheritance . ... ......The truth is that among the Muslim nations of to-day Turkey alone has shaken off its dogmatic slumber, and attained to self-consciousness. She alone has claimed her right of intellectual freedom ; she alone has passed from the ideal to the real—a transition which entails keen intellectual and moral struggle. To her the growing complexities of a mobile and broadening life are sure to bring new situations suggesting new points of view, and necessitating fresh interpretation of principles which are only of an academic interest to a people who have never experienced the joy of spiritual expansion. It is, I think, the English thinker Hobbes who makes this acute observation that to have a succession

of identical thoughts and feelings is to have no thoughts and feelings at all. Such is the lot of most Muslim countries to-day. They are mechanically repeating old values, whereas the Turk is on the way to creating new values.

কিন্তু ইকবাল নিজে বদলালেও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের প্রভাব মুস্‌লিম জনসাধারণের উপরে অন্য রকমের হওয়া বিচিত্র নয়। মনীষী বার্ণার্ড শ' বলেছেন—পরাধীনতায় যে ভুগছে তার অবস্থা 'ক্যান্‌সার'গ্রস্ত রোগীর মতো, যে-কেউ চেঁচিয়ে বলে সে ওষুধ জানে তারই শরণাপন্ন সে হয়। 'মুসলমান বড় অবনত পতিত' এই inferiority complex-এর জন্য তার উপর ইকবালের বাণীর প্রভাব অবাঞ্ছিত রকমের হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

মুস্‌লিম জনগণের সামনে এই যে দুই পথ তার বিচিত্র পাথেয় নিয়ে উন্মুক্ত হয়েছে এর কোন্‌টি শেষ পর্য্যন্ত তাদের অবলম্বন হবে সে-উত্তর আজ দেওয়া সম্ভবপর নয়। 'বুদ্ধির মুক্তি'র আদর্শ নিশ্চয়ই খুব সহজসাধ্য আদর্শ নয়; তবে মানুষের সাধনা দিন দিন কঠিনতর হচ্ছে, আর এতেই তার আনন্দ, তাই ভয় পাবারও কিছু নেই। আজ হয়ত মুসলমানের পক্ষে প্রয়োজন একান্ত ক'রে ভাবা কোন্‌টির কি ফল। তারই সঙ্গে সঙ্গে inferiority complex-এর স্থানে জীবনে আনন্দ ও শ্রদ্ধা এবং মানুষের অসীম সম্ভাবনায় বিশ্বাস তার পক্ষে যদি সত্য হয়—তবে সেটি হবে তার পক্ষে ও জগৎ বা বৃহত্তর দেশের পক্ষে যেন এক দৈব অনুকম্পা।

তাহ'লে আজকের এই পতিত ভারতীয় বা বাঙালী মুসলমানই হবে অন্ততঃ তার নিজের দেশের জন্য কল্যাণের সিংহদ্বার।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

# আমাদের কথা

[ আবুল হুসেন সাহেব "তরুণের সাধনা" নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ "সওগাতে" প্রকাশ করেন। তাতে তিনি রামমোহনের মুক্তবুদ্ধি ও স্বদেশ-প্রেমের সাধনার দিকে তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁকে বিদ্রূপ করে মিঃ এস, ওয়াজেদ আলি মাসিক "মোহাম্মদী"তে এক দীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করেন। উক্ত পত্রেই তার প্রতিবাদ করেন অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন। তাঁর প্রতিবাদে "বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সাধনা" লেখাটি মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হয় ]

জনাব সম্পাদক সাহেব, আপনার আষাঢ়ের "মাসিক মোহাম্মদী"তে "বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সাধনা" নামে যে লেখাটি বেরিয়েছে তার উৎপত্তি এক বাদানুবাদসূত্রে ; সে-বাদানুবাদে লিপ্ত হ'বার আগ্রহ আমার নাই। আমি শুধু আপনার লেখক সাহেবের কয়েকটি প্রধান যুক্তিতর্কের দুর্ব্বলতার উল্লেখ করতে চাই। আপনার লেখকের সেই সব যুক্তিতর্ক হয়ত "মোহাম্মদী"-ভাবুকসঙ্ঘেরই যুক্তিতর্ক।

১। অতীতকে বর্ত্তমান দিয়ে বুঝতে হবে,—একথা আপনার লেখক ভ্রমপূর্ণ বলেছেন। বর্ত্তমান অর্থ বর্ত্তমান কার্য্যকারিতা—এই সোজা কথাটা কেন তাঁর কাছে দুর্ব্বোধ্য হ'ল বোঝা শক্ত। যাঁর লেখার প্রতিবাদে এই "বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সাধনা" লেখাটীর উৎপত্তি তাঁর ও 'তাঁর দলস্থ সাহিত্যিক'দের লেখায় একথা ব্যক্ত হয়েছে। আপনাদের অপ্রিয় 'একদল সাহিত্যিক' যে প্রচলিত ইসলামে সন্তুষ্ট হ'তে পারছেন না তার কারণ, এর বর্ত্তমান কার্য্যকারিতা তাঁরা দেখছেন না, এর জ্ঞানকাণ্ডের প্রচলিত ব্যাখ্যায় তাঁদের মন ওঠে না। কোনো-কিছুর ভবিষ্যৎ কার্য্যকারিতা আছে এ একটী আশার বা নিরাশার কথামাত্র। ভবিষ্যৎ কার্য্যকারিতা সত্যই যাঁদের লক্ষ্য তাঁরা কাজের সূচনা করেন বর্ত্তমানে।

২। আপনার লেখক ইঙ্গিত করেছেন—প্রকৃতির মতো ইসলাম চিরন্তন, চিরশক্তিমন্ত। কিন্তু সে কোন্ অর্থে? কোরআনে যে বলা হয়েছে জগতের সমস্ত পয়গম্বরের ধর্ম্ম ইসলাম, মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ইসলাম, সেটা এই অর্থে যে চিরকালই মানুষ এক জগৎ-কারণের সন্ধান করে' এসেছে, তাঁর বশ্যতা স্বীকার ও সৎজীবন যাপন এ-সমস্ত কথা বলেছে। বলা যেতে পারে এ হচ্ছে সমস্ত ধর্ম্মের ঐক্যস্থল। কিন্তু ধর্ম্মে ধর্ম্মে ঐক্যই তো শুধু নাই, বিরোধও তো প্রবলভাবে আছে, আর সেই বিরোধ বা বৈশিষ্ট্যই তো ভাবনা-চিন্তার বড় বিষয়। তাই ইসলাম বলতে শুধু "আমেনু ও আমেলুস্ সালেহাত" এই তত্ত্বই বোঝায় না, কোরআন, হাদিস, ফেকাহ্, ফেকাহ্‌র টীকা, যায় একালের আলেমদের ভালমন্দ ফতোয়া, সবই বোঝায়। Abstract (তত্ত্বগত) ইসলাম ও Applied (ব্যবহারিক) ইসলামের এই পার্থক্য লক্ষ্য না করে' এবং একের জায়গায় আরকে টেনে এনে আপনার লেখক পাঠক-সাধারণের সময় ও মনের উপর জুলুম ভিন্ন আর কিছুই করেন নাই।

৩। আপনার লেখকের মত—ইসলাম এখনো জীবন্ত ও বীর্য্যবন্ত কেননা কোর্‌আন হাদিস আগেকার মতো এখনো বর্ত্তমান। এই ধরণের চিন্তা যে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ একথা আমাদের তরফ থেকে বলা হয়েছে। আর একবার বলতে চেষ্টা করা যাক।

কোর্‌আন হাদিসে কি আছে তা জানবার জন্য আরবী শিখতে হয়, অথবা যাঁরা আরবী জানেন তাঁদের কৃত অনুবাদ পাঠ করতে হয়। শুধু তাই নয়, কোর্‌আন ও হাদিসের বিশেষ ভাষা বিশেষ প্রকাশভঙ্গী এ সমস্তের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। এও পর্য্যাপ্ত নয়, কোর্‌আন হাদিসের যুগের বিস্তৃত ইতিহাস, কোর্‌আনের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহুদি ও খ্রীষ্টান

ধর্ম্মশাস্ত্র, কোর্‌আনের পরবর্ত্তী মুসলিম সভ্যতার বিকাশ প্রভাব ও পতন ইত্যাদির খবরদারী করতে হয়,—আর, এ সমস্তের চাইতে বড় কথা, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির নিজের ভিতরে চাই কিছু স্বভাবদত্ত সুবুদ্ধি। কোর-আন হাদিসের সত্যকার সার্থকতা যখন নির্ভর করে কমবেশী এতগুলো ঘটনার উপরে তখন অত্যন্ত সোজা করে' যদি বলা হয় যে ইসলাম পূর্ব্ববৎ জীবন্ত ও বীর্য্যবন্ত কেননা কোর্‌আন হাদিস বর্ত্তমান তবে সোজা কথাই বলা হয় মাত্র, কিন্তু সত্য কথা নয়।—বীজ থেকে বৃক্ষ হয় এ খুবই একটী প্রচলিত কথা। তবু একটু ভাবতে গেলেই বোঝা যায়, এ আংশিক সত্য। বীজ থেকে বৃক্ষ পর্য্যন্ত রয়েছে নানা অনুকূল ঘটনার পারম্পর্য্য। বীজ থেকে বৃক্ষ হয় এ যতখানি সত্য কোর্‌আন থেকে ইস্‌লামের (ধর্ম্মজীবনের) উদ্ভব হয় এ ততখানি সত্য নয়, কেননা বৃক্ষ ও বীজের নিত্যযোগ, কিন্তু কোরআনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির অন্তরেও ইস্‌লামের (ধর্ম্মজীবনের) আবির্ভাব হ'তে পারে। (হজরত এব্‌রাহিমের আল্লাহ্‌র ধারণায় উপনীত হ'বার কাহিনী স্মরণীয়)।

হয়তো আপনার লেখক এই কথাটী বলতে চেয়েছেন যে অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের চাইতে মুসলমান-ধর্ম্মগ্রন্থ সুরক্ষিততর হ'য়ে এসেছে, তাই এর প্রবর্ত্তকের মনে কি সংকল্প ছিল তা বুঝতে পারা অপেক্ষাকৃত সহজ। এ যুক্তি অনেক ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ মুসলমানই উপস্থিত করে' থাকেন। শুধু ধর্ম্মগ্রন্থ যে ধর্ম্ম-জীবনের জন্য যথেষ্ট নয় সে-সম্বন্ধে আগেই কিছু বলা হয়েছে। তা ছাড়া কোনো ধর্ম্মগ্রন্থ অবিকৃত অবস্থায় আছে এ ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের জন্য খুব বড় সংবাদ, ধর্ম্মজীবনের জন্যও আনন্দ-সংবাদ নিশ্চয়ই,—একটা ধর্ম্মজীবনের অবিকৃত ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় হবে এর দাম বাস্তবিকই খুব বেশী—কিন্তু তবু ধর্ম্মজীবন হচ্ছে মুখ্যতঃ

মানবচিত্তের এক নব উন্মেষ, অন্য কথায়, সে-ই ধার্ম্মিক যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে সজাগ হয়েছে অথবা বিশ্বজগতের সঙ্গে প্রেম ও কল্যাণের যোগে যুক্ত হয়েছে ; আর মানব-চিত্তের এই নব-উন্মেষে বিকৃত বা অবিকৃত সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ, মনীষীর মনীষা, বিশ্বপ্রকৃতি, সবই কিছু কিছু সাহায্য মাত্র। অন্যান্য চিন্তাশীলের মতো ধার্ম্মিকও eclectic, তাঁর পছন্দ বা প্রয়োজন মতো জীবন-পথের পাথেয় বা প্রেরণা তিনি আহরণ করেন গ্রন্থ, মানব-প্রকৃতি, বিশ্বপ্রকৃতি, সব-কিছু থেকে। মানুষের নিজের ভিতরকার এই যে সৃষ্টিধর্ম্ম, creativeness, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের এই মূলীভূত কারণ, মনে হয় আপনার লেখক সাহেব এই এক গোড়ার কথা বিস্মৃত হয়ে ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় মনোনিবেশ করেছেন।

৪। মিঃ এস্, ওয়াজেদ আলীর অনুবর্ত্তিতায় আপনার লেখক বলেছেন, ইস্লাম Rationalistic ধর্ম্ম। ইস্লাম জগতের বড় ধর্ম্মগুলোর সর্ব্ব কনিষ্ঠ, তাই যুক্তি-বিচারের আদর তাতে বেশী হওয়া স্বাভাবিক। আর বাস্তবিকই কোর্আনে বিচার কাণ্ডজ্ঞান এ-সবের উপরে যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছে, মো'জেজা (অলৌকিকতা) দেখাবার আগ্রহ হজরতের নাই বল্লেই চলে। তবু এ সত্য যে কোরআনে বহু মো'জেজার কথা আছে, হাদিসে দজ্জাল, কেয়ামত, বেহেশ্ত, দোজখ, ইত্যাদি সম্বন্ধে এমন সব কথা আছে যাকে হয় সেকালের লোকের ধারণা বলতে হবে—নইলে সে-সমস্তের রূপক ব্যাখ্যা দিতে হবে। কোর্আনের একালের তফ্সির-কার মৌলবী মোহাম্মদ আলী কতকটা অনিচ্ছাসত্ত্বে ব্যক্ত করেছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী তফ্সির-কারদের অনেকে অলৌকিকতার দিকে যথেষ্ট প্রবণতা দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ইব্নে সা'দ, ইব্নুল আসির, ইব্নে খলদুন প্রমুখ মুসলিম ঐতিহাসিক থেকে সামান্য উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়েও দেখছি, হজরত সম্বন্ধে

অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে তাঁরা আদৌ অনিচ্ছুক ছিলেন না, হয়তো আগ্রহান্বিত ছিলেন। বোধ হয় ইব্নে খলদুনে এই কথাটী আছে—বিবাহের পূর্ব্বে হজরত যখন বিবি খোদেজার উট নিয়ে বাণিজ্য থেকে ফিরছেন তখন তাঁর ( বিবি খোদেজার ) বাঁদী দেখলে, হজরতের মাথার উপরে দুই ফেরেশ্তা ছায়া দিতে দিতে আস্ছে।

ইস্লাম, অথবা যে-কোনো ধর্ম্ম, Rationalistic এ কথা যাঁরা বলেন তাঁরা Rationalism ও ধর্ম্ম দুইয়েরই সম্বন্ধে অত্যন্ত ভাসা-ভাসা কথা বলেন মাত্র। ধর্ম্ম সম্বন্ধে জনৈক ভাবুক বলেছেন—Religion is life before God and in God···অন্যত্র . the soul penetrated with the sense of the infinite is in the religious state. কোর্আনের বহু জায়গায় এই মর্ম্মের কথা আছে—২ : ১৩১ ; ৩০ : ২৬ ; ১৭ : ৪৪ ; ৩১ : ২২ ইত্যাদি। Rationalism ( বিচার-বাদ ) থেকে এর জন্য কিছু সাহায্য পাওয়া যেতে পারে মাত্র।···Religion differs from philosophy as the simple and spontaneous self differs from the reflecting self, as synthetic intuition differs from intellectual analysis. We are initiated into the religious state by a sense of voluntary dependence on, and joyful submission to, the Principle of order and of goodness. Religious emotion makes man conscious of himself ; he finds his own place within the infinite unity, and it is this perception which is sacred. ( Amiel's Journal —p. 153 )

৫। আপনার লেখক এবং আপনি নিজে বহুবার বলেছেন, আমরা ইস্লাম মানি না অথচ সে-কথা সোজাসুজি বলবার সাহসও

আমাদের নেই। কোন্ লাভের আশায় আমরা এমন "মোনাফেক্" সেজেছি তা ভেবে পাওয়া বাস্তবিকই দুষ্কর! যদি এইই আপনাদের ধারণা হয়ে থাকে যে সমাজের প্রবল বিরুদ্ধতার সামনে আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করতে আমরা সাহস করি না, তাই আস্তে আস্তে স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টায় আছি, তা হ'লে সমাজের কল্যাণকামী হিসাবে আপনাদের উচিত, আমাদের সেই দুর্ব্বলতার দিকে চোখ না দিয়ে কোন্ দুঃখে আমরা এ পথ অবলম্বন করেছি সেই সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

আসল কথা, আমরা (বড় হই বা ছোট হই) সাহিত্যিক; আমাদের চারপাশের দুঃখ-বেদনা বাণী খুজে ফিরছে আমাদের মনে। সাহিত্য দরদীর কথা। সাহিত্যের সমজদারেরও হওয়া চাই স্বাভাবিক দরদী মানুষ, সাম্প্রদায়িকতার পাণ্ডা নয়। আপনার লেখক তাঁর লেখাটীর প্রথম অনুচ্ছেদেই সাহিত্য ও 'কালচারে'র লক্ষ্য ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে যা বলেছেন তাতেই বোঝা গেছে বেহালার তাঁত দিয়ে ফাঁসীর রজ্জু তৈরীর সাধনা তাঁর। খোদা জানেন, এ বিড়ম্বনা ভোগ আমাদের এই দুর্ভাগা দেশের ভাগ্যে আরো কতকাল আছে; কিন্তু এর পেছনে পেছনে "আমীন" বলি, বাস্তবিকই এ ক্ষমতা আমাদের নাই।

সাহিত্যিক ধর্ম্মহীন নন। তবে এ সত্য যে তাঁর ধর্ম্মের ধারণা ও সাম্প্রদায়িকের ধারণা এক পর্য্যায়ের নয়। মৌলবী মোহাম্মদ আলী কোরআনের একটী আয়াতের অনুবাদ দিয়েছেন এই—Those who listen to the word and then follow the best of it, those are they whom Allah has guided and those it is who are the

men of understanding. (39 : 18). প্রচলিত কথায় যাকে 'মুসলমানি' বলা হয় যাঁদের ভিতরে তার অভাব দেখে আপনারা আজ নিন্দায় ধিক্কারে পঞ্চমুখ হয়েছেন, হতে পারে, সেই অপকীর্ত্তি-তদেরই ভাগ্য হয়েছে কোর্‌আনের এই best-এর (শ্রেষ্ঠ অংশের) সাধনায় রত হওয়া।

শ্রাবণ, ১৩৩৭

# বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তার আদর্শ

কিছুদিন পূর্ব্বে কোনো মাসিক পত্রে একটি লেখা পড়েছিলাম—কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে সেকালের বাংলার জাতীয় জীবন কেমন প্রতিফলিত হয়েছে এই সম্পর্কে। লেখক কড়া লোক, অমন সুপ্রাচীন কবি-কঙ্কণকেও তিনি খাতির করেন নাই মোটেই, বরং তাঁর ভাঁড়ু দত্ত, কালকেতু প্রভৃতি যে মোটের-উপর হীন শ্রেণীর জীব, কোনো জাতির শ্লাঘার বস্তু নয়, এসব কথা এতটুকু আব্রু রেখে বলবার প্রয়োজনও তিনি অনুভব করেন নাই। আমার আজকার এই লেখাটিও সেকালের বাংলার জাতীয় জীবনের কাহিনী দিয়ে আরম্ভ করা যেতে পারতো; কিন্তু 'জাতীয়তা' বলতে যে সজ্ঞান প্রচেষ্টা বোঝায় সেটি যখন বিশেষ-ভাবে একালের তখন প্রাচীন মহাজনদের শান্তিতে বিঘ্ন না ঘটানোই হয়ত শোভন।

একালের বাংলার জাতীয় জীবনের সূচনা রামমোহন থেকে—এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমরা অন্যত্র করেছি—কিন্তু একালের বাংলা সাহিত্যে জাতীয় জীবনের সমস্যার আলোচনার সূচনা বোধ হয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় থেকেই। তাঁর সতীর্থ রাজনারায়ণ বসু সুবিখ্যাত "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক প্রস্তাব" লিখেছিলেন, টেকচাঁদ ঠাকুরের হিন্দুত্বের বিশেষতঃ হিন্দুনারী-জীবনের আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে পাদ্রীদের মসীযুদ্ধও প্রণিধানযোগ্য,—কিন্তু তবু "সামাজিক প্রবন্ধ" ও "পারিবারিক প্রবন্ধে"র রচয়িতা ভূদেবের স্থান বাংলার জাতীয়তা-সমস্যার আলোচনার ইতিহাসে খুব উচ্চে এই জন্য যে এইসব বইতেই হিন্দুত্বকে বিস্তারিতভাবে যুক্তি-তর্কের দিক দিয়ে দেখতে চেষ্টা করা

হয়েছে, প্রতিপক্ষের মত খণ্ডন করবার চেষ্টাও হয়েছে যুক্তি-তর্কের সাহায্যেই—বিশেষতঃ সুপরিচিত হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের অভিনব চেষ্টাও এই সব গ্রন্থে আছে।

একালে ভূদেবের আগে পর্য্যন্ত হিন্দু-সমাজের উপর দিয়ে বেশ এক ঝড় বয়ে যায়; পাদ্রিদের নিন্দা, ব্রাহ্মদের সংস্কার-চেষ্টা, হিন্দু-কলেজের আঘাত, এই ত্রিবিধ আক্রমণে হিন্দুসমাজ নিজেকে বিপন্ন বোধ করে। এ-সবের মধ্যে হিন্দু-কলেজের নব্য হিন্দুর আক্রমণই হয়ত হিন্দু-সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করেছিল কিছু বেশী, কেননা They were enemies within the citadel (ঘর-শত্রু); আর এই আঘাতের নিষ্করুণতার জন্যই প্রতিঘাত হিন্দু-সমাজের পক্ষে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। প্রতিঘাতের পদ্ধতি কিছু দিন থেকে সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে আসছিল;—ব্রাহ্মদের উপনিষদের আশ্রয় নেওয়া, বাইবেল থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে যত্নবান হওয়া, রাজনারায়ণ বসুর "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক প্রস্তাব," প্রভৃতিতে এই প্রতিঘাতের অস্ত্রের যোগান চলছিল; এর সঙ্গে শশধর তর্কচূড়ামণির প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের চমক-প্রদ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও সুপণ্ডিত চরিত্রবান ভূদেবের স্বজন-বাৎসল্যের যোগ হলো।—মানুষ স্বভাবতঃ রক্ষণশীল; ভূদেব পর্য্যন্ত হিন্দু-মনীষার এই যে অভিনব আবিষ্কার দাঁড়ালো যে হিন্দুধর্ম্ম জগতের সর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, হিন্দু-সমাজ চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, এ-কে পূর্ণ সত্যের মর্য্যাদা দিতে হিন্দুসমাজের দেরী হলো না আরো বিশেষ ক'রে এই জন্য যে সত্বরই বঙ্কিম রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রতিভার প্রসন্ন আলোক এই চিন্তধারার উপরে পতিত হলো।

ভূদেবকে আজো অনেকে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রে থাকেন। দুই-একজনকে ঠাট্টা করতেও শুনেছি এই বলে' যে তাঁর ভিতরে নিজের

বংশের শ্রেষ্ঠ-ব্রাহ্মণত্বের গৌরব প্রবল ছিল। কিন্তু এ সত্য যে ভূদেব বাস্তবিকই একালের বাংলার চিন্তাক্ষেত্রে এক প্রবল ব্যক্তি—তাঁকে সেই চিন্তার ক্ষেত্রে অতিক্রম ক'রে যেতে পারেন এমন হিন্দু ( অথবা মুসলমান—মুসলমানেরা স্বভাবতঃ ভূদেব প্রমুখ চিন্তানায়কদের কাছ থেকে তাঁদের স্বধর্ম্মগৌরবের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন ও করছেন) দেখি নাই বল্লে অত্যুক্তি হয় না। ভূদেবের এই হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক চিন্তাই বাংলার একালের মনীষীদের সাধারণ লক্ষণ, বলা যেতে পারে ; তাঁদের কেউ কেউ বা জোর দিয়েছেন উপনিষদের উপরে, কেউ কেউ পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের উপরে, কেউ বা হিন্দু-ইতিহাসের সব কিছুরই উপরে। অবশ্য আল্‌বেরুনী থেকে আরম্ভ ক'রে একালের রম্যাঁ রলাঁ পর্য্যন্ত অনেক প্রথিত-যশাঃ অহিন্দুও হিন্দু সাধনার উচ্চ প্রশংসা করেছেন, আর হিন্দুর মতো একটা সুপ্রাচীন সভ্যজাতির ইতিহাসে গৌরবজনক অনেক-কিছু যে থাকবে এ যেমন স্বাভাবিক তেমনি সঙ্গত, তবু একালের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-চিন্তানায়কদের আত্মপ্রশংসা যে-রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে ও যে-ফল ফলিয়েছে তা বুঝতে চেষ্টা করা এ-কালের বাংলার জিজ্ঞাসুদের জন্য নানা কারণেই অবশ্য-কর্ত্তব্য ; পরিবর্ত্তনশীলতা মানুষের ইতিহাসের এক নিত্য লক্ষণ, সেই পরিবর্ত্তন হয়ত কিছু পরিমাণে সুনিয়ন্ত্রিতও হতে পারবে এই-সব অনুসন্ধানের সাহায্যে।

আত্মপ্রশংসা-মাত্রই দোষার্হ নয় ; অনেক সময়ে আত্মপ্রশংসা আত্মবিকাশেরই এক রূপ। গ্রীক, মুসলমান, ইংরেজ, জার্ম্মাণ, ফরাসী, এঁদের সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যে অল্প পরিচয়টুকু ঘটে তারও ভিতর দিয়ে বুঝতে পারা যায়, আত্মগৌরববোধ এঁদের কারো ভিতরে কম নয়। কিন্তু এঁদের আত্মপ্রশংসার সঙ্গে একালের বাঙালীর

আত্ম-প্রশংসা মিলিয়ে দেখলে পার্থক্য যেটি সেটি সহজেই চোখে পড়ে। জগতের বুকে দৃঢ়পদে দাঁড়াবার ও বিচরণ করবার ক্ষমতা থেকে উৎসারিত হয় যে একটী সহজ আত্মগৌরববোধ, সেই স্বাভাবিকতার প্রভামণ্ডিত আত্মপ্রশংসা একালের বাংলা সাহিত্যে দুর্ল্ভ; একালের বাংলা সাহিত্যিকদের আত্মপ্রশংসার মূলে রয়েছে বরং তার্কিকতা—প্রবল প্রতিপক্ষের সামনে নিজেদের বজায় রাখবার একটা চেষ্টা।

তার উপর এই সব হিন্দু সমাজ-তাত্ত্বিকদের সমস্ত চিন্তার মূলে রয়েছে এক শোচনীয় দায়িত্বহীনতা। ভূদেব তো তাঁর কালের ব্রিটিশ-ভারতকেই প্রায় চিরন্তন্ ভারত ধরে নিয়েছেন। দেশ-রক্ষা ও দেশ-শাসনের বৃহৎ দায়িত্ব রয়েছে সবল শাসকদের স্কন্ধে, সে-দায়িত্ব যে কত বিচিত্র বাস্তবতায় সুকঠোর সে-সম্বন্ধে দেশের চিত্ত সচেতন করবার প্রয়োজনও তেমন অনুভূত হয় নাই, এই শান্তির ও স্বস্তির আওতায় কেমন ক'রে একটি সম্মানিত ভব্য ধর্ম্ম-জীবন যাপন সম্ভবপর ভূদেবের অনেকখানি সমস্যাই এই সমস্যা। তাই বাংলার বা ভারতের ভবিষ্যৎ ওজস্বল জাতীয় জীবন ভূদেবের মতো একজন সুপণ্ডিত সচ্চরিত্র সুপ্রসিদ্ধ কিন্তু হ্রস্বদৃষ্টি চিন্তা-নায়কের ঋণ-স্বীকার অতি সামান্যই করবে মনে হয়।

ভূদেবের পরে বঙ্কিমচন্দ্র কালানুসারে; কিন্তু বাংলার সর্ব্বসাধারণের উপরে প্রভাব বিস্তারে অগ্রবর্ত্তী বঙ্কিমচন্দ্রই—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার প্রসন্ন আলোক ভূদেবের চিন্তাধারার উপরে পড়েছিল ব'লেই তা'র ঐতিহাসিক মর্য্যাদা এত বেশী। নব-বাঙ্গালীত্বের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র এ-সম্বন্ধে দ্বিমত নেই—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তাঁর কালের একজন কর্ম্মী ব'লে নিজেকে পরিচিত করতে অগৌরব বোধ করেন নাই। বঙ্কিম প্রতিভাবান, তাই

স্বভাবতঃই তিনি অনেকখানি সত্যাশ্রয়ী। তিনি তাঁর স্বদেশবাসী মুসলমানদের সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেছেন—এদেশের যে সব মুসলমান গরু খায় তারা নরাধম ; তবু এই অসহিষ্ণু বঙ্কিমচন্দ্রই 'বঙ্গদেশের কৃষকে'র দুর্দ্দশার কাহিনী লিখেছেন, পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকারের কথা বলেছেন, আর প্রবল ইচ্ছা-শক্তির সাহায্যে যুগযুগাগত জড়তা কাটিয়ে উঠ্‌তে নানা ভাবে নির্দ্দেশ করেছেন। বাংলাদেশের সর্ব্বসাধারণের উপরে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব যাই ই হোক তাঁকে বাস্তবিকই যাঁরা বুঝতে চেষ্টা করেন তাঁদের বুঝতে দেরী হয় না যে মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় কত গভীর। কিন্তু তবু কেন সঙ্কীর্ণ হিন্দুত্বের অভিমান তাঁর ভিতরে এত প্রবল তা বহু রকমে ভেবেও আমি নিজে তেমন সুমীমাংসায় পৌঁছুতে পারিনি। হতে পারে স্বভাবদত্ত প্রতিভার তীক্ষ্ণ চঞ্চল আলোকে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের অনেক-কিছুই তাঁর চোখে প্রতিভাত হয়েছিল, কিন্তু সমগ্রভাবে দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি মহান্ বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সৃষ্টিধর্ম্মী নয় উজ্জ্বল মরীচিকা-ধর্ম্মী—এ-কথাটি আপাততঃ অনেকের কানে রূঢ় শোনাতে পারে, কিন্তু সেদিন হয়ত দূরে নয় যেদিন তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্তরাও বলবেন—জাতীয় জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্ব অস্বীকার না করলে কাল ও পরিবেষ্টনের সঙ্গে দ্বন্দ্বই হবে বাঙালীর ভাগ্য। বাঙালী বলতে আমরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে বাংলা দেশের সব লোকই বুঝ্‌ছি। মুসলমানদের অনেকে বলতে চান বটে তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধী, কিন্তু যে-ভাবে তাঁরা তাঁর বিরোধিতা করতে প্রয়াস পান তা প্রকৃতই তাঁর অনুকরণ। সঙ্কীর্ণ ও উগ্র জাতীয়ত্বই বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ত্র, সে-মন্ত্রের মোহ কাটিয়ে উঠবার মতো মানসিকতা আজো দেশের কোনো সম্প্রদায়েরই হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী কিন্তু অপরিচিত কেশবচন্দ্র বাংলার জাতীয় জীবনের আর এক দিকের উৎকর্ষ বিধানে ব্রতী হয়েছিলেন—ধর্ম্মের ক্ষেত্রে। কেশবচন্দ্রের প্রতিভা ছিল আশ্চর্য্য ধরণের। সাধারণতঃ তাঁর রচনায় সাহিত্যিক সৌষ্ঠব খুব বেশী নয়, কিন্তু তাঁর 'জীবন-বেদ' বাংলা সাহিত্যে এক পরমোৎকৃষ্ট কাব্য এই হিসাবে যে ধর্ম্মজীবনের আকুলি-বিকুলির এক চমৎকার রূপ ফুটেছে এতে। এ ভিন্ন তাঁরই নির্দ্দেশক্রমে তাঁর প্রচারকবর্গ বিভিন্ন ধর্ম্মসাহিত্য মন্থন ক'রে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে নব নব সাহিত্য-রত্ন দান করেছেন। এই সব প্রচেষ্টার ফলে বাংলার জাতীয় জীবন বৃহত্তর ও গভীরতর হবে এ আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু বিজ্ঞান-প্রভাবান্বিত ঊনবিংশ শতাব্দীতেও কেশবচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত বেশী mystic ( মরমিয়া ) ; তাই তাঁর প্রভাবে বাংলার জাতীয় জীবন ধর্ম্মময় তত হতে পারে নাই যত হয়েছে ধর্ম্মোন্মত্ত; অন্য কথায়, কর্ম্মহীন ও গতিহীন। কেশবচন্দ্রের প্রতিভা কেন এমন একটা অবাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করলে এ-সম্বন্ধে অনেক কথাই ভাবা যেতে পারে। এর জন্য দোষ কেশবচন্দ্রকে না দিয়ে তাঁর দেশবাসী-দেরও দেওয়া যেতে পারে—তাঁরা শুধু তাঁর ভাবোন্মত্ততা না নিয়ে তাঁর জ্ঞান ও কর্ম্মময় জীবন থেকে প্রেরণা বেশী ক'রে গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু এর জন্য শেষ পর্য্যন্ত কেশবচন্দ্রকেই দায়ী করা ভিন্ন হয়ত গত্যন্তর নাই। এক বৃহৎ মানব-পরিবারের ধর্ম্মজীবন বলতে যে একটি বিপুল বীর্য্যবন্ত অভিনব জীবনযাপন বোঝায় সে-সম্বন্ধে সচেতনতা কেশবচন্দ্রের ভিতরে ছিল না এ সত্য নয়, কিন্তু তবু কেমন ক'রে যেন তিনি সেই অভিনব বিরাট জীবন সর্ব্বান্তঃকরণে চাইতে পারেন নাই। সত্য ও কল্যাণের আকর্ষণে কেশবচন্দ্র আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু সমসাময়িক কালের সুপরিচিত জীবন-ধারার জন্য তাঁর মমতা হয়ত তারও চাইতে বলবত্তর ছিল।

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কথা এসে পড়ে, যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র রমেশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির কথা এসে পড়ে—শুধু পার্থক্য এই যে হেম-নবান প্রমুখ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবর্ত্তীরা অনেকখানি শক্তিহীন অনুবর্ত্তী, কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেশবচন্দ্রের চাইতে অনেক বেশী আধিপত্য বাংলার জাতীয় জীবনের উপরে বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন।

কিন্তু আমাদের আলোচনাস্থল বিবেকানন্দই, রামকৃষ্ণ তেমন নন, কেননা তিনি একালের বাংলার নূতন নর দেবতা—তাঁর মর্য্যাদা তাঁর দেবত্বেরই জন্য, নরত্বের জন্য তেমন নয়। তাঁকে এক বড় সমন্বয়াচার্য্য-রূপে দাঁড় করাবার চেষ্টা কেউ কেউ করেছেন, কিন্তু যাঁর মনোজীবন গভীর ও চমৎকার হলেও অল্পপরিসর তাঁকে নিয়ে এক্ষেত্রে বাদানুবাদ না করাই শোভন।

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে মহানুভব রলাঁ্যা এক জায়গায় বলেছেন—তাঁর প্রতিভার বিরাটত্ব এইখানে যে জীবনের পর্ব্বত-প্রমাণ দুঃখের সামনে তিনি ভীত হন নাই—যে-ভয় হয়ত বুদ্ধদেবেও লক্ষ্যযোগ্য।—বিবেকানন্দ নির্ভীক ছিলেন সন্দেহ নাই, মানুষের সঙ্গে একটি সহজ প্রীতির যোগও তাঁর ছিল, তবু মানুষের দুঃখ বুঝবার ধৈর্য্য তাঁর ভিতরে ছিল তা মনে হয় না। আমাদের মনে হয় বিবেকানন্দ জীবনে একটি সুসামঞ্জস্য লাভ করবার পূর্ব্বেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর ভিতরকার সাহস শেষ পর্য্যন্ত রয়ে গেছে একটি ব্যক্তিগত সাহস। যাকে বলা হয় বহু জনের জন্য সত্যের আবিষ্কার ও প্রয়োগের সাহস সে-গৌরব তাঁকে দিতে পারলে আজ আমরা জাতীয় জীবনে অনেক বিড়ম্বনার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারতাম।

বিবেকানন্দ সুপণ্ডিত ও সুলেখক ; কিন্তু তাঁর প্রধান কীর্ত্তি দেশের বুকে সেবাশ্রমের বিস্তার। এর পেছনে যে আত্মসম্মানবোধ ও স্বদেশ-বাৎসল্য রয়েছে সেটি আমাদের পরম আনন্দ ও শ্রদ্ধার সামগ্রী। তবু এ-কথা আমাদের ভাবতেই হবে যে সন্ন্যাস ও ভিক্ষার সাহায্যে দেশের দুঃখ দূর করতে চেষ্টা করা ছেঁড়া কাপড় তালি দেওয়ার চাইতে বড় কাজ নয়। সন্ন্যাস জীবনের বহু অলঙ্কারের এক অলঙ্কার ; ভিক্ষার সাহায্যে অর্থনৈতিক অসাম্যের রূঢ়তা ঈষৎ শ্রীমণ্ডিত হতেও পারে ; কিন্তু মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সমৃদ্ধিই, ভিক্ষা বা দীনতা নয়। বিবেকানন্দও জাতির জন্য দীনতা চান নাই—তাঁর নিজের বেশও দীন-বেশ ছিল না। জাতির পরিবেশ ও চিত্ত উভয়েরই সমৃদ্ধির জন্য তিনি যে তেমন বিশেষ আয়োজন করতে পারেন নাই তার কারণ মনে হয় তাঁর অস্থিরতা—স্বসম্প্রদায়ের আশু উন্নতির জন্য অস্থিরতা। এ অস্থি-রতা শ্রদ্ধেয় নিশ্চয়ই, কিন্তু এ কথাও ভুললে চল্‌বে না যে অস্থিরতা সব সময়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল হয় না, অনেক সময়েই হয় প্রতিকূল।

হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সম্পর্কে বিবেকানন্দের একটি কথা সুবিখ্যাত, তিনি বলেছেন—ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে ইসলাম-দেহ ও বেদান্ত-মস্তিষ্ক। কিন্তু কথাটি কিছু সুচিন্তার উদ্রেক করলেও এর ভিতরকার দুর্ব্বলতা অল্পেই চোখে পড়ে। ইসলাম ও বেদান্ত দুয়েরই বর্ত্তমান অনুবর্ত্তীরা জগৎ-সভায় সম্মানের আসনে আসীন নন—আর সত্যের মর্য্যাদা সত্যের সেবক থেকেই। তা'ছাড়া ইসলাম ও বেদান্তের যে-সমন্বয় ভারতীয় জীবনকে জগতে গণনার বস্তু ক'রে তুলবে সে-সমন্বয়ের চেষ্টা তিনি বা তাঁর শিষ্যেরা কেউই তেমন করেন নাই,—করলেও এমন জিনিষ হয়ত দাঁড়াতো যা দেখে বেদান্ত-বাদী ইসলাম-বাদী কেউই খুশী হতে পারতেন না।—হয়ত বেদান্তের ভিতরে ইসলাম আছে ও

ইসলামের ভিতরে বেদান্ত আছে, তাই জাতির সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রয়োজন নানা-বিরুদ্ধতা-খণ্ডিত পুরাতন মতবাদের জোড়াতালি তেমন নয় যেমন সমসাময়িক জাগতিক জীবনের কল্যাণ-অকল্যাণ উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা ও অক্লান্ত সাধনা।—কর্ম্মী বিবেকানন্দও বাস্তবিকই কর্ম্মী তেমন নন, অনেকখানি খেয়ালী।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রায় সমস্ত কর্ম্ম-ও-চিন্তা-নেতাই জাতীয় জীবনে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অনুভব করেছেন, বলা যেতে পারে। কিন্তু সে-পরিবর্ত্তন জাতীয় জীবনে প্রকৃতই কার্য্যকরী হবার জন্য যে খুব বড় রকমের হওয়া চাই—হয়ত আমূল—সে-বোধ জেগেছে দুই জনের ভিতরে—রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ। এই সম্পর্কে মধুসূদনের নাম করা যায় না শুধু এই জন্য যে তাঁর ভিতরে জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রণের সজ্ঞান প্রচেষ্টা অতি কম। কেউ কেউ বলতে পারেন—রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের ভিতরেও Scholasticism যথেষ্ট—তাঁরা প্রাচীন শাস্ত্রের নূতন ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন, তাও ব্যবহারিক জীবনে তেমন নয়, চিন্তাক্ষেত্রেই—ফলে প্রাচীন-পন্থিত্ব আমাদের ঘোচে নাই। এই ধরণের চিন্তার প্রতি আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা যথেষ্ট, শুধু বলতে চাই—রামমোহনকে এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা দুঃসাধ্য, কেননা তাঁর কর্ম্মের আয়োজন সুবিপুল, আর তাঁর দৃষ্টি যে পিছনে নিবদ্ধ নয় সামনে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত, তা বুঝতে এতটুকুও বেগ পেতে হয় না; আর রবীন্দ্রনাথকে কিছু পরিমাণে অভিযুক্ত করা সম্ভবপর হলেও তাঁর প্রবণতা কোন্ দিকে তা বুঝতে না পারা তাঁর দেশবাসীর পক্ষে অশোভন। তাঁর 'অচলায়তনে'র আচার্য্য, 'গোরা'র 'পরেশ', চতুরঙ্গের 'শচীশ', এঁরা কেউ কূলের শান্তি চান নাই, স্রোত ও আবর্ত্তের উপরে নিজেদের সঁপে দিয়েছেন।

কিন্তু তবু এ সত্য যে জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ সাধনে রবীন্দ্র-প্রতিভা আশানুরূপ কার্য্যকরী হয় নাই। ভূদেবের স্বস্তি, বঙ্কিমচন্দ্রের উগ্রতা, কেশবচন্দ্রের ভাবোন্মত্ততা, বিবেকানন্দের খেয়ালিত্ব, জাতীয় জীবনের জন্য এ-সমস্তেরই অপকারিতা সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন; কিন্তু তিনি যে কবি, মানুষের ও প্রকৃতির সভায় চির-আনন্দময় গায়ক, এই বোধ কর্ম্মীর যোদ্ধৃবেশ গ্রহণে বারবার তাঁর ভিতরে কুণ্ঠা এনে দিয়েছে। এতে তাঁর সাহিত্যের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং এক হিসাবে বৃদ্ধি পেয়েছে—আত্মপ্রকাশে-ব্যস্ত মানুষের সমাজে এ-কুণ্ঠা কত দুর্লভ—কিন্তু কবির সমসাময়িক বাঙালী জীবন কিছু পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বৈ কি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সার্থকতা তুলিত হতে পারে সুফী-সাহিত্যের সার্থকতার সঙ্গে। সুফী-সাহিত্য বহু দেশের বহু ব্যক্তির মনোজীবনে আশ্চর্য্য সুফল ফলিয়েছে, তবু বৃহত্তর সমাজজীবনে সে-সাহিত্যের প্রভাব আশানুরূপ সুন্দর নয়।

সমাজ-জীবনে রবীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশ কিছু সুস্পষ্ট করতে প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর প্রতিভাবান শিষ্য শরৎচন্দ্র; আর এ-কার্য্যে কিছু সাফল্যও তিনি অর্জ্জন করেছেন। তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত গ্রন্থ "শেষ প্রশ্ন" উপন্যাস না হতে পারে, একদেশদর্শিতাও তাতে যথেষ্ট, তবু একালের সর্ব্বকল্যাণরোধী হিন্দুত্ব-অভিমান ও তারই পেছনে-পেছনে-আসা মুস্‌লিমত্ব-অভিমান তাঁর হাতে যে আঘাত খেয়েছে তাতে দেশের মোহমুক্তির কিছু সহায়তা হবে আশা করা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্রের ধরণের পরিচ্ছন্ন চিন্তা তাঁর সমকালবর্ত্তী দুইজন মুসলমান সাহিত্যিকের ভিতরেও ফুটেছে—একজন কাজি ইমদাদুল হক অপরজন লুৎফর রহমান। শুধু এঁদের ত্রুটি এই—দেশের আম-দরবারে আসন গ্রহণ ক'রে কথা বলতে এঁরা পারেন নাই, অথবা সাহস করেন নাই।

যাকে বলা যেতে পারে সুব্যবস্থিত বীর্য্যবন্ত জাতীয় জীবন তার আয়োজন একালের বাংলার সাহিত্যে ও জীবনে কম হয়েছে আমরা দেখেছি। কিন্তু কি ভাবেই বা এ-ত্রুটির স্খালন সম্ভবপর ?

এ-সম্বন্ধে কাগজে-পত্রে সভা-সমিতিতে শুধু জল্পনা-কল্পনাই চলতে পারে, সত্যকার কর্ম্মারম্ভ অপেক্ষা করছে নবভাবোদ্দীপ্ত কর্ম্মীর। সেই ধরণের একটি জল্পনা-কল্পনার অবতারণা করা যেতে পারে।

সত্যকার জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্যে দুটি কর্ম্ম ও চিন্তাধারার কথা সহজেই মনে পড়ে—প্রথমটী, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান-চেষ্টা, দ্বিতীয়টি, জাতীয় জীবন সুনিশ্চিত অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা। শিক্ষা ও স্বরাজ-সাধনা অর্থনৈতিক সমস্যার অন্তর্গত ক'রে ভাবাই সঙ্গত, আর সে-ভাবে না ভাবলে শিক্ষা ও স্বরাজ-সাধনা হয়ত শেষ পর্য্যন্ত আমাদের কাছে ভাববিলাসের ব্যাপারই রয়ে যাবে। আমি নিজে এই শেষোক্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান-চেষ্টাই আপাততঃ বেশী প্রয়োজনীয় মনে করি। জাতিভেদ ও হিন্দু-মুসলমান সমস্যার মীমাংসার ভার আমাদের ভিতরকার ক্রমঃ-বর্দ্ধমান বৈজ্ঞানিকতার উপরে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে—অর্থনৈতিক সুমীমাংসাও এ-সবের সাহায্য করবে।

কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যার সুমীমাংসা তো সহজসাধ্য নয়! সহজসাধ্য নিশ্চয়ই নয়, তবে এর একটি যোগ্য ভিত্তির পত্তন হতে পারে শাসক ও শাসিত সকলেরই ভিতরে এই চিন্তা যদি প্রবল হয় যে, দেশে অভুক্ত ও কর্ম্মহীন কেউ থাকবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ-কল্যাণ-চিন্তায় এক একটি মারাত্মক দৈন্য ছিল যে সমাজ ও রাষ্ট্রকে দুই বিভিন্ন, এমন কি পরস্পর-বিরোধী, শক্তিরূপে কল্পনা করা হয়েছিল ; তারই ফলে সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে-যুগের শ্রেষ্ঠ

কর্ম্ম। দেশের রাজনৈতিক অবস্থিতি সম্বন্ধে সূক্ষ্মদৃষ্টি রবীন্দ্রনাথও দেশের রাজশক্তিকে কতকটা বিরুদ্ধশক্তিই ভেবেছেন। কিন্তু রাজশক্তিকে যেমন ক'রেই হোক দেশের সম্পদবৃদ্ধির কাজে লাগাতে না পারলে দেশের ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের উন্নতি বাস্তবিকই অসম্ভব। আর দেশের এই সম্পদ-বৃদ্ধির কাজে রাজশক্তিরও ব্রতী হওয়া স্বাভাবিক, কেননা সম্পদের প্রয়োজন তার অত্যন্ত বেশী। দক্ষ মাঝি প্রতিকূল হাওয়াকেও বহু পরিমাণে তার কাজে লাগাতে পারে। দক্ষ জাতীয় কর্ম্মীও তেমনিভাবে রাজশক্তির অপ্রসন্নতা সত্ত্বেও তার সাহায্যে জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ বিধানে অগ্রসর হতে পারে। এ কল্পনা নয়, ভাগ্যবান দেশের ইতিহাসে জনসাধারণের সঙ্গে রাষ্ট্রের এই দৃঢ় যোগ খুবই লক্ষ্যযোগ্য।

অবশ্য এই অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধিই যে জাতীয় জীবনের উৎকর্ষের জন্য যথেষ্ট তা নয়; আর্থিক স্বাচ্ছল্য জীবনের খুব বড় একটি কাম্য কিন্তু একমাত্র কাম্য নয়। কিন্তু মনে হয় বাংলা দেশে অন্যান্য সৃষ্টির সূচনা কিছু কিছু হয়েছে, এখন, সবারই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার জন্য সমস্ত দেশ দায়ী, এই চিন্তার ভিতরে আপামরসাধারণের প্রতি যে একটা শ্রদ্ধা ও কর্ত্তব্য-বোধ আছে তাইই হয়ত বিশেষভাবে সাহায্য করবে আমাদের সমস্ত চেষ্টার সত্যাশ্রয়ী হতে। আর প্রাচীনত্বের অভিমান নয় সত্যাশ্রয়ের প্রয়োজনই আমাদের জন্য অত্যন্ত বেশী— আমাদের সাহিত্য, বীর্য্যবন্ত জাতীয় জীবন, সব ক্ষেত্রেই।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

# বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠে দুই জন মহাপুরুষকে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছেন—একজন সত্যানন্দ অপরজন চিকিৎসক। এই দুই জনেরই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আনন্দমঠের একটী জায়গায় অল্প কয়েকটী কথায় তিনি সুস্পষ্ট ক'রে তুলেছেন—যেখানে সন্তানদের আত্মদানের ব্যর্থতা লক্ষ্য ক'রে সত্যানন্দ কেঁদে আকুল হয়ে বলছেন, "হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না"···আর চিকিৎসক তাঁর হাত ধ'রে সুগম্ভীর কণ্ঠে বলছেন, "···চল, জ্ঞান লাভ করিবে চল, হিমালয়ের শিখরে মাতৃমন্দির আছে, সেখান হইতে মাতৃমূর্ত্তি দেখাইব।"—এখানে সত্যানন্দের সুগভীর বেদনা ও চিকিৎসকের সুগভীর স্থৈর্য্য দুইই আঁকা হয়েছে পরম মনোহারী ক'রে। সত্যানন্দের হৃদয়ের জ্বালা বুঝতে আমাদের এতটুকু দেরী হয় না; আর চিকিৎসকের জ্ঞান ও স্থৈর্য্যের সামনে সহজেই আমরা সম্ভ্রমশীল হই।

মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিটী একাধারে এই সত্যানন্দ ও চিকিৎসক। সত্যানন্দের ভিতরে তিনি দেখেছেন কর্ম্ম আর চিকিৎ-সকের ভিতরে দেখেছেন ধর্ম্ম, আমরা বলি—সত্যানন্দ অসহিষ্ণু আর চিকিৎসক দৃষ্টিমান।

এই অহিষ্ণুতা ও সত্যদৃষ্টি, একই সঙ্গে এই দুই প্রায় পরস্পর-বিরোধী ভাব, বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে কেন প্রবল হলো বলা শক্ত। তবে হয়েছে, এ হয়ত মিথ্যা নয়। রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনায় প্রতিভাবান বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসহিষ্ণুতা (তাঁর ভাষায়—কলহপ্রিয়তা) লক্ষ্য ক'রে দুঃখিত হয়েছেন। যে কেউ কোনো কারণে তাঁর কিঞ্চিৎ বিরাগভাজন হয়েছেন তাঁকেই তাঁর এই অসহিষ্ণুতার নির্ম্মমতা সহ্য করতে হয়েছে।

শক্তিশালী বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসহিষ্ণুতা সম্পর্কে আমাদের একটী বিশেষ কথা মনে পড়ছে। ভারতবাসী যে বারবার পরপদদলিত হয়েছে এতে যন্ত্রণাবোধ তারা কম করে নাই নিশ্চয়ই, কিন্তু কেমন ক'রে যেন সে-যন্ত্রণা তাদের নিজেদের মধ্যেই পরিপাক হয়েছে বেশী। 'পরিপাক হয়েছে' কথাটা ব্যবহার করা হয়ত সঙ্গত হলো না, 'কেমন করে তারা সয়ে গেছে' আপাততঃ এই কথাটা ব্যবহার করা যাক। এই ধরণের সয়ে যাওয়া সম্পর্কে মনীষী আল্‌বেরুণী এই মন্তব্যটি করেছেন—"মাহ্‌মুদের আঘাতে এদেশের শ্রীসম্পদ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে…হিন্দুরা দিগ্বিদিকে ধূলিকণার মতো বিক্ষিপ্ত হয়েছে…এই সব চূর্ণবিচূর্ণ কণার অন্তরে মুসলিম-বিদ্বেষ নিদারুণ।"—কিন্তু সেই নিদারুণ বিদ্বেষ বিদ্বেষ-পোষণকারীর অন্তরকেই তো জ্বালিয়েছে বেশী; এ ভিন্ন অন্য ধরণের সার্থকতা কতটুকুই বা তার লাভ হয়েছে।

উপদ্রুত মানুষের চিরন্তন রূপ শেক্‌স্‌পীয়রের 'শাইলক্'—বাইরে কেমন সহনশীলতা, ভিতরে প্রতিহিংসার আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। অত্যাচারিত হওয়াও বাস্তবিক মানুষের জন্য এক অতি বড় অভিশাপ। কবি মিথ্যা বলেন নাই—

…অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ-সম দহে।

বঙ্কিম-সাহিত্যে যে সব মুসলিম-ইতিহাসের উল্লেখ আছে তার দুই-একখানির সঙ্গে একটু-আধটু পরিচয়ের ফলে আমরা বুঝেছি—আজ বঙ্কিমের কশাঘাতে বাংলার প্রতিষ্ঠাহীন মুসলিম যেমন ক্ষুব্ধ ও ম্রিয়মাণ হয়েছেন, বিজেতা মুসলিমের দৃষ্টির সামনে বিজিত হিন্দুও নিজেকে একদিন তেম্‌নি বিপন্ন বোধ করেছিলেন। একটা বড় গাছ অত্যন্ত সহজভাবে পাশের একটা ছোট গাছের জীবন-লীলার প্রতিবন্ধক হয়ে

দাঁড়ায়। বিজেতা মুসলিমের সামনে বিজিত হিন্দু যে সেদিন অনেকখানি অস্বস্তি, এমন কি, অসম্মান অনুভব করেছিলেন, এ স্বাভাবিক।

পর্য্যুদস্ত ভারতবাসীর যুগযুগসঞ্চিত ব্যথা যদি শক্তিমান বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে অভিযান ঘোষণা ক'রে থাকে, তবে এক-হিসাবে তা খুব স্বাভাবিক কাজই হয়েছে।—তবে বঙ্কিমচন্দ্রকে অসহিষ্ণু আমরা বলি এজন্য যে, অন্যায়ের তাড়নায় তিনি যা করেছেন তাও অন্যায়, এই অন্যায়ের জের টেনে চলে' বাস্তবিক কোনো সত্যকার লাভের আশা নাই, অন্যায় করা ও অন্যায় সওয়া এই দ্বিবিধ পাপের কবল থেকে মুক্তি পাওয়াই মানুষের জন্য কাম্য—এ-চেতনা তাঁর ভিতরে দেখা দিয়েছে ক্ষীণভাবে।

কিন্তু ক্ষীণভাবে হ'লেও দেখা যে দিয়েছে, এই আমাদের পরম লাভ। তাঁর পরম বেদনার ধন সত্যানন্দকেও তিনি নির্ম্মম হয়ে শুনিয়ে দিতে পেরেছেন—"তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না"—এতেই আমরা তাঁকে বল্‌তে পারি দৃষ্টিমান।

মানুষ সর্ব্বস্ব-পণে একেবারে পাগল হ'য়ে যুদ্ধ করে; কিন্তু সেই যুদ্ধকথা উত্তরকালে হয় শিশুর কৌতূহলোদ্দীপক—বয়স্ক মানুষ আর তাতে তেমন আনন্দ পায় না। ভারতের হিন্দু-মুসলমানের কয়েক শতাব্দীব্যাপী রেষারেষী দ্বেষাদ্বেষীও কালে হয়ত অর্থশূন্য কিন্তু অতি-অদ্ভুত ঘটনা ব'লে মানুষের মনে হবে। তখন জ্ঞানী ও শক্তিমান বঙ্কিমচন্দ্রকে মানুষ ভালবাস্‌তে পারবে সন্দেহ নাই কিন্তু তাঁর অসহিষ্ণুতা হবে তাদের জন্য পরম কৌতুকাবহ।

ফাল্গুন, ১৩৩৮

# শিক্ষা-সঙ্কট

বর্ত্তমান জগতে মানুষের জীবন বড় জটিল ও অস্বস্তিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। কি তার জন্য কাম্য, কি নয়, এই নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদের আর অন্ত নাই। ধ্রুব বলে' কোথাও কিছু আছে কি না এই সংশয় জনসাধারণে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হচ্ছে।

তবু যে-সব দেশ ভাগ্যবান সে-সব দেশে এই বিপদ কাটিয়ে উঠবার চেষ্টাও কম হচ্ছে না। মানুষের এতদিনের জ্ঞান ও বিশ্বাসের সব-কিছুই যদি ঝালিয়ে নিতে হয় তবে তা' নিতে হবে, এ-সঙ্কল্প যাঁদের অন্তরে প্রবল তাঁদের জন্য বেশীর ভাগ বিপদ কেটে গেছে বলা যেতে পারে।

কেউ কেউ বলতে পারেন, নানা-অভাবে-জর্জ্জরিত আমাদের এ-দেশও এই ধরণের এক ভাগ্যবন্ত দেশ। তাঁদের মতে, ভারতবাসী আজ নিষ্ক্রিয় নয়, তাদের সামনে সকল লক্ষ্যের বড় লক্ষ্য রাষ্ট্রনৈতিক লক্ষ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এসব কথার বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাওয়া হয়ত অশোভন। কিন্তু সন্দেহ-কীট যাদের অন্তরে প্রবেশ করেছে তাদের পক্ষে মৌনের মাধুর্য্য উপভোগ করাও সম্ভবপর নয়। আমাদের দেশের আধুনিক চিত্ত যে কত বিশৃঙ্খলা-পূর্ণ তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে দেশের শিক্ষার অবস্থা একটু মনযোগ দিয়ে দেখলে।

যে-ভাষা আমাদের মাতৃভাষা নয় তার সাহায্যে শিক্ষালাভ করলে তাতে অনেক ত্রুটি যে অনিবার্য্য হয়ে পড়ে এ-বিষয়ে আমাদের দেশের চিন্তাশীলেরা বোধ হয় একমত। এই সমস্যার মীমাংসার চেষ্টাও এতদিনে হয়ত আরম্ভ হতো যদি নানা অনিবার্য্য রাজনৈতিক কারণে শিক্ষা-সমস্যা আমাদের দেশের লোকদের চোখে নগণ্য হয়ে না পড়ত।

কিন্তু শিক্ষার বাহনের সুমীমাংসা হলেও শিক্ষার অবস্থা যে আশানুরূপ সুন্দর হবার পথে দাঁড়াবে সে-আশায় আশান্বিত হওয়া শক্ত এই একটি কারণে যে, শিক্ষা দান বা গ্রহণ করবে যে-মন তার অবস্থায় যদি কিছু অস্বাভাবিকত্ব থাকে তবে শুধু শিক্ষাদানের ভাষার পরিবর্ত্তনে বাঞ্ছিত ফললাভ না হওয়াই সম্ভবপর। এই সুব্যবস্থিত মনের অভাব নানা কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুপ্রকট হয়ে উঠেছে এই অভিযোগ আজ-কাল শিক্ষার্থীদের গুরুজনদের অনেকেরই মুখে শোনা যায়। কিন্তু সমস্যা যদি এই-ই হতো তবে ব্যাপার মোটেই কঠিন হতো না, কেননা জ্ঞানের ক্ষেত্রে যারা প্রবেশার্থী তাদের ত্রুটী নগণ্য। এই মনের গণ্ডগোল আমাদের দেশে এর চাইতেও জটিল—এ-ব্যাধিতে হয়ত বেশী করে' ভুগছেন শিক্ষার্থীদের গুরুস্থানীয়েরাই।

এই ব্যাধি দেশের গুরুস্থানীয়দের আক্রমণ করেছে হয়ত এই সব দিক থেকে :—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবন-যাপন-প্রণালীর সংঘর্ষ ; এ-কালের প্রাচ্য জীবনে যে-সব চিন্তাধারা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে দেশের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সে-সবের কি যোগ সে-সব অনুধাবনে অনিচ্ছা ; দারিদ্র্য।

অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে বল্‌তে শুনেছি, পাশ্চাত্য প্রভাবে আমরা জীবনে আদর্শহীন হয়ে পড়েছি বড় বেশী। কিন্তু পাশ্চাত্য লোকেরা বাস্তবিকই ত আদর্শহীন নন, আর পাশ্চাত্য আদর্শের পরিবর্ত্তে অন্য আদর্শ ( তা হোকনা দেশের প্রাচীন আদর্শ ) তাঁরা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেন না কেন, এ সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক উত্তর তাঁদের মুখে শুনি নাই। দারিদ্র্য তাঁদের এ-অবনতির কারণ বলা চলে না, কেননা, যে-সব শিক্ষক দরিদ্র নন আদর্শনিষ্ঠার অভাব তাঁদের ভিতরেও কম লক্ষ্যযোগ্য নয়।

কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাব ও দারিদ্র্য আমাদের জীবনে যে-বিশৃঙ্খলা এনে দিয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী বিশৃঙ্খলা এনে দিয়েছে একালে আমাদের দেশে যে-সব চিন্তাশীলের জন্ম হয়েছে তাঁদের প্রভাব। প্রতিভাবান শক্তিমান নিশ্চয়ই কিন্তু তাঁর সাহচর্য্য বা অনুবর্ত্তিতা করতে হয় সজাগ ভাবে, কেননা, শক্তিমান বলেই ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব-বর্জ্জিত তিনি নন, আর সে-বিশেষত্ব যুগ-ধর্ম্মের প্রভাবে গঠিত; তাই এক যুগের মহাপুরুষের অনুবর্ত্তিতা অন্য যুগের লোকদের করতে হয় যথেষ্ট সচেতন হয়ে, নইলে তাঁদের জন্য যেটি সবচাইতে বাঞ্ছিত— তাঁদের যুগে তাঁদের সমসাময়িক জগতে তাঁদের জীবনকে সার্থক করা— তা থেকেই তাঁরা বঞ্চিত হন। দৃষ্টান্ত থেকে কথাটা বুঝতে চেষ্টা করা যাক। এই বাংলাদেশে রামমোহন থেকে শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত যে-সব শক্তিশালী লোক জন্মেছেন নানা কারণে তাঁদের একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য যথেষ্ট, এমন কি, কোথাও কোথাও বিরোধিতা সুস্পষ্ট। এঁদের প্রায় সবারই জীবন থেকে বুঝবার ও গ্রহণ কর্‌বার অনেক কিছু আছে, কিন্তু সে-কাজটি বাস্তবিক খুব সহজ-সাধ্য নয়। এই সব বিরোধিতা একটি সামঞ্জস্যে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা আমাদের দেশের শিক্ষিতেরা যে করেননি তা নয়, যেমন, হিন্দুত্বের এক নূতন মহিমা তাঁরা এ-সবে দেখেছেন। কিন্তু এ-দেখা যে সত্য দেখা হয় নাই তার প্রমাণ পাওয়া গেল তখন যখন হিন্দু-মুসলমান-সংঘর্ষে হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব উভয়েরই এক ঘৃণিত রূপ জগতের সামনে ফুটে উঠ্‌ল। —আর বাস্তবিক জীবন এমনি করেই চলে। একদিনের খাওয়ায় যেমন অন্যদিনের চল্‌তে চায় না এক যুগের চিন্তায়ও তেমনি অন্য যুগের চলে না।

এই হিন্দু-মুসলমান-সমস্যাও বাংলাদেশে শিক্ষার এক বিশেষ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একালের বাংলা সাহিত্যে হিন্দুত্বের এক বিভ্রমময়ী

ছটা ফুটেছে। সেইখানেই হয়ত এ-কালের বাংলা সাহিত্যের দুর্ব্বলতা। কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানের সখ—তাঁরও জন্য বাংলাদেশে ও বাংলা সাহিত্যে এমনি গৌরব-কীর্ত্তন চাই। সে-চাওয়া কতদিনে সফল হবে, অথবা আদৌ হবে কি না, জানিনা; কিন্তু এর এই এক ফল ফলেছে যে পাঠ্য-পুস্তকে সব শ্রেণীর লোকের প্রিয় ব্যক্তিদের কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে কথাগুলো হয়ে যাচ্ছে অনেকখানি অর্থহীন; শিক্ষকরাও ভাসা-ভাসা ধরণে সবাইকে ভাল বলে কর্ত্তব্য শেষ করছেন। সার্থক জীবন-যাত্রার জন্য বিচারপরায়ণতা আমাদের চাই-ই তা' যত ভুল-ত্রুটির ভিতর দিয়েই সে-বিচার চলুক—সেই বড় প্রয়োজন শিক্ষকরা এমনি গণ্ডগোলে সমাধা করতে পারছেন না, বা করছেন না।

শিক্ষকরা এই মানসিক বিশৃঙ্খলার জন্য যথেষ্ট অস্বস্তি অনুভব করছেন না কেন তার দুটি কারণ নির্দ্দেশ করা যেতে পারে,—একটি, দেশের রাজনৈতিক গণ্ডগোল, সেই গণ্ডগোলে আত্ম-অন্বেষণ প্রায় অসম্ভব; অপরটি, জনসাধারণের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য। পুত্রকন্যার শিক্ষাদানে যে-অর্থব্যয় তাঁদের হচ্ছে তার বিনিময়ে তাঁরা কি পাচ্ছেন এ-প্রশ্ন তাঁরা নিজেদের ভাল করে' করতে পারছেন না এজন্য যে কিছুদিন আগেও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সনদ যোগাড় কর্‌তে পারলেই অন্নের ব্যবস্থা একরকম হতে পারত, সেই মোহ আজও পূরোপূরি কাটে নাই। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জন নিশ্চয়ই, কিন্তু সদুপায়ে অর্থার্জ্জনও ঘৃণার সামগ্রী আদৌ নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষের ভিতরকার সুপ্ত সৃষ্টি-শক্তিকে সচেতন করা তবে যে-শিক্ষা মানুষের প্রয়োজনীয় জীবিকা আহরণের জন্য সাহায্য করে না সে-শিক্ষা কেন আদৌ শিক্ষা নামে খ্যাত হবে, এ-প্রশ্ন জনসাধারণের মনে জাগলে শিক্ষকদের

হুশিয়ার হয়ে উঠ্‌তে হবে অনেকখানি। কিন্তু দায়িত্বও মানুষ গ্রহণ করতে পারে ইচ্ছুক হয়ে বা অনিচ্ছুক হয়ে। দেশের জনসাধারণ যখন দেশের শিক্ষকদের প্রদত্ত শিক্ষার মূল্য যাচাই করতে চাইবেন তখন সে-পরীক্ষা যদি তাঁরা শ্রদ্ধার ভাবে গ্রহণ কর্‌তে পারেন তবে সেইটিই হবে দেশের জন্য কল্যাণকর।

সমুদ্রগামী জাহাজের জন্য যেমন নাবিক, সমাজ বা দেশের পক্ষেও তেমনি শিক্ষক। আরোহীরা কত বিচিত্র খেয়াল ও খুশীর ভিতর দিয়ে দিন কাটাতে থাকেন, নাবিকরা সে-সব দেখেন, সময় সময় তাঁদের বুকও আন্দোলিত হয়, তবু জাহাজ চালনা তাঁদের বড় লক্ষ্য এ-ব্যাপারে ভুল হওয়া মারাত্মক। সমাজ বা দেশের বিচিত্র জীবন-যাত্রাও তেমনি শিক্ষকের বুকে স্পন্দন জাগাতে পারে, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তিনি শিক্ষক—মানুষের মনের লালন, শৃঙ্খলা-বিধান, তাঁর বড় কাজ, এবং সেই জন্য তিনি স্বদেশ-প্রেমিক বা বিশেষ-ধর্ম্ম-প্রেমিক ইত্যাদি যাই হোন তারও উপরে তিনি বৈজ্ঞানিক, man of science, বিচার-বুদ্ধি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন—একথা বিস্মৃত হলে মানুষের সেবাও আর তাঁর দ্বারা হয় না।

আমাদের দেশের শিক্ষক-সমাজ আজ মনোজীবী নন, বড়-জোর ভাবপ্রবণ—মনে হয় শিক্ষা-ব্যাপারে এ এক বিষম সঙ্কট।

মুস্‌লিম সাহিত্য-সমাজের ষষ্ঠবার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। চৈত্র, ১৩৩৮

# মোহাম্মদ আলী

মওলানা মোহাম্মদ আলীর কথা ভাব্‌তে গেলেই সর্ব্ব প্রথমে চোখে পড়ে তাঁর তেজ। জীবনে দুঃখ ও লাঞ্ছনা তিনি কম ভোগ করেন নাই। কিন্তু সমস্ত দুঃখ-ভোগের গ্লানি ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর তেজ, আর রসিকতার দীপ্তি ও প্রসন্নতা। বাস্তবিক মোহাম্মদ আলী এমন একজন লোক, শত্রু মিত্র সবাই যাঁর সম্বন্ধে বলতে পারেন— "With all thy faults I love thee still".

মোহাম্মাদ আলীকে হারিয়ে মুসলমান-সমাজ বান্ধব-হারা হয়েছে। তিনি মুসলমান-সমাজকে যে-ভাবে চালিত করতে চেয়েছিলেন তাতে তার কতখানি কল্যাণ-সাধন হয়েছে, অথবা আদৌ হয় নাই, সে-সব ভাববার কথা; কিন্তু তিনি যে এ-সমাজের সুন্দর অসুন্দর সমস্ত মানুষকে ভালবেসেছিলেন, তাদের জন্য ধন-মান জীবন-যৌবন পণ করেছিলেন, শুধু এরই দাম তো কম নয়। ব্যক্তিগত জীবনেই হোক অথবা সামাজিক জীবনেই হোক আত্মভোলা প্রেম তো নিজেই অনন্ত-কল্যাণবাহী। আর এই প্রেম সংসারে বাস্তবিকই কত দুর্লভ!

মোহাম্মদ আলী যে শুধু মুসলমানকে ভালবাসতেন তা নয়; জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তাঁর সমস্ত দেশবাসীকেও তিনি কম ভালবাসতেন না। কিন্তু সেই বৃহত্তর প্রেম বিকশিত করে তুলবার অবসর তিনি হয়ত পান নাই। তাঁর নিকটবর্ত্তী মুসলমানের দুর্দ্দশা হয়ত তাঁকে সারা জীবন আকুল করে রেখেছিল বেশী। জানি না, কোন্ অভিসম্পাতের জন্য জামালউদ্দীন স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ আমীর আলী মোহাম্মদ আলীর মত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য "হায় মুস্‌লিম! হায় ইস্‌লাম!"-এর অশ্রুপাতে জগতের সামনে শ্রেষ্ঠ প্রকাশের সার্থকতা হতে বঞ্চিত হয়েছে।

মোহাম্মদ আলী বহুবার বলেছেন, "প্রথমে আমি মুসলমান, তার পর ভারতবাসী।" জাতীয়তাবাদী হয়েও এ-কথা বলার জন্য ভারতের অন্যান্য জাতীয়তাবাদী হয়ত এখনো তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন নাই। কিন্তু এ-কথা বলে বাস্তবিকই তো কোনো অন্যায় তিনি করেন নাই; বরং তাঁর অন্তরাত্মাকে তিনি জগতের সামনে পরিব্যক্ত করেছেন। ইস্‌লাম বলতে তিনি বুঝতেন মনুষ্যত্বের এক আদর্শ। হজরত মোহম্মদ সাম্যের ও সমস্ত মানুষের জীবনের মর্য্যাদার যে-বাণী প্রচার করে গেছেন তা যে মানুষের জন্য পরমকল্যাণকর এ-বিশ্বাস তাঁর ভিতরে ছিল সুনিবিড়। কর্ম্মী তাঁর জ্ঞান-বিশ্বাস অনুসারেই কর্ম্মের আয়োজন করেন। এই-ই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। মোহাম্মদ আলী যদি তাঁর অন্তর-প্রদীপের আলোকে নিজে চলতে ও তাঁর স্বদেশবাসীকে চালাতে চেয়ে থাকেন তবে তিনি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কাজই করতে চেয়েছিলেন।

তবে তাঁর সম্প্রদায়ের অনেকের পক্ষে তাঁর এই কথার কদর্থ সম্ভবপর। কিন্তু সে-কদর্থ তো অনেক কিছুরই সম্ভবপর। সেই জাতির লোকেরাই ভাগ্যবান যাঁরা তাঁদের প্রতিভাবানদের প্রতিভার আলোকে পথ চলতে চেষ্টা করেন, সেই আলোর স্তবগান করে বা প্রদক্ষিণ করে সময় কাটানো অমূল্য জ্ঞান করেন না।

মোহাম্মদ আলী জাতীয়তাবাদী ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তার চেয়েও হয়ত বেশী ছিলেন (অথবা তাঁকে হতে হয়েছিল) Pan-Islam-বাদী। জগতে Pan-Islam-বাদের অভ্যুত্থান খুবই এক স্বাভাবিক ঘটনা। দেখতে দেখতে সমস্ত মুসলমান-রাজ্য অমুসলমানদের করতলগত হচ্ছে—এরই বিরুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাঁচবার চেষ্টার এক নাম Pan-Islamism. ভারত তাত্ত্বিকের দেশ, Pan-Islam-তত্ত্বেরও ভক্ত যথেষ্ট পরিমাণে এখানে জুটবে

এতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। কিন্তু Pan-Islam-বাদ দেখতে প্রকাণ্ড হলেও সেই প্রকাণ্ডতার জন্যই এ কর্ম্মক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্ব্বল। মুস্তফা কামাল রেজাশাহ্ প্রমুখ রাজনৈতিক ধুরন্ধরেরা মুস্‌লিম-জগতকে সে-কথা বোঝাতে প্রয়াস পেয়েছেন। বলা বাহুল্য মোহাম্মদ আলী সে-কথা বুঝতে চান নাই—অথবা বুঝবার সময় পান নাই।

মোহাম্মদ আলী তাঁর সম্প্রদায় ও দেশকে যেখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন সেখান থেকে কোন্ দিকে এখন তাদের নূতন যাত্রা শুরু হবে তাঁর সত্যকার ভক্তদের উচিত, সেই কথাটি বিশেষভাবে ভাবা। তিনি Pan-Islam-বাদী ছিলেন এটী যতশীগ্‌গির অতীত ইতিহাসের বিষয় হয়, আর তিনি ধার্ম্মিক অর্থাৎ কল্যাণ-অন্বেষী ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন এটী যতশীগ্‌গির বর্ত্তমানের উপজীব্য হয়, মনে হয়, ততই মোহাম্মদ আলীর প্রতিভা তার যোগ্য সার্থকতা লাভ করতে থাক্‌বে। অতীতের অনেক অতিকায় জীব ধারাপৃষ্ঠে আর বর্ত্তমান নাই। তেমনি অতীতের সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদেরই দোসর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধর্ম্ম-সঙ্ঘ-বাদ, (Pan-Islamism তারই একটী) এ-সবেরও হয়ত জগতে আর প্রয়োজন নাই। একালের একজন মনীষী বল্‌ছেন; "Let us live rationally and nationally", মোহাম্মদ আলীর সুবৃহৎ চিত্তে rationalism ও nationalism-এর যে বীজ লুক্কায়িত ছিল তাকেই মহীরুহে বর্দ্ধিত করে তোলা তাঁকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের আজ হয়ত সব-চাইতে বড় কাজ।

১৩৩৮

# রামমোহনের বিরুদ্ধ-পক্ষের বক্তব্য

জনৈক খ্যাতনামা সাহিত্যিক সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Sanskrit Bengali Association-এ "রামমোহন রায়" নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। তাতে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় এই:—রামমোহন রায়কে বাংলার নবযুগ ও নবজীবনের গুরু ও পথনির্দ্দেশক বলা হয়; এই কথাটাই এবারকার শতবার্ষিক অনুষ্ঠানসমূহে অতি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করার চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু এ-সম্মান তাঁর প্রাপ্য নয়। তার কারণ, প্রথমতঃ তাঁর যে পৌত্তলিকতা-বিরোধী ধর্ম্ম-মীমাংসা তা হিন্দু-সাধনার সম্পূর্ণ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এই জন্যই দেখা-যায়, পরে পরের হিন্দু-মনীষী (যেমন রামকৃষ্ণপরমহংস বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ) প্রকারান্তরে তাঁর ঘোর প্রতিবাদই করেছেন। রামমোহন সম্বন্ধে শুধু এই কথা বলা যায় যে তিনি একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি তার্কিক—তখনকার দিনের জাতীয় সুষুপ্তির ভিতরে কিছু চেতনাবান্ পুরুষ।

যে ভাবে যুক্তিতর্কের সাহায্যে এই গুরু বিষয়ের মীমাংসার পথে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি তা করেন নাই। তাঁর প্রবন্ধে বিচারপরায়ণতার চাইতে বিশ্বাসপরায়ণতার স্থান লাভ হয়েছে অনেক বেশী। তবে আশা আছে, শেষ পর্য্যন্ত যুক্তিবিচারের আশ্রয়ই তাঁকে নিতে হবে। তাই বিচারের দিক থেকেই তাঁর ক্রটি-নির্দ্দেশ কর্ত্তব্য।

১। রামমোহনের চরিত্র সম্বন্ধে যে-সব কথা তিনি বলেছেন তার প্রমাণ রয়েছে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রামমোহন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে। ব্রজেন্দ্র-বাবুর ঐতিহাসিক

তথ্যের আবিষ্কার মূল্যবান্, কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত এখনো অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হয়। তার কারণ, প্রথমতঃ, তা যথেষ্ট তথ্যমূলক নয়, দ্বিতীয়তঃ, রামমোহনের চরিত্র অর্থাৎ মানসজীবন তাঁর রচনায় ও অন্যান্য কার্য্য-কলাপে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার সঙ্গে এই-সব নব-আবিষ্কৃত তথ্যের কি সত্যকার সম্পর্ক তা নিরূপণ করতে চেষ্টা করা হয় নাই। ব্রজেন্দ্র-বাবু রামমোহনকে ১৪ বৎসর বয়সে স্বগ্রামে ও ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে পিতার জমিদারীতে দেখ্‌তে চান। কিন্তু এই সব তথ্যের সঙ্গে রামমোহনের বাল্যজীবনে পাটনায় ও কাশীতে বিদ্যাভ্যাস ও তিব্বত-ভ্রমণের সত্যকার বিরোধ নাই। পিতার টাকা সুদে খাটিয়ে তিনি যে অর্থশালী হয়েছিলেন ও পরে এই দান অস্বীকার করেছিলেন এই সিদ্ধান্তেরও প্রমাণাভাব। রামমোহন যৌবনে কিছুদিন কলকাতায় কোম্পানীর কাগজের কেনা-বেচা করে' অর্থোপার্জ্জন করেছিলেন, দেখা যাচ্ছে। এই ধরণের জীবিকা-অর্জ্জ-নের চেষ্টা তিনি একাধিকবার অনায়াসেই করতে পারেন। নব-যৌবনে সে-শক্তি ও অবসরের অভাব তাঁর নাই। তাঁর শৈব-বিবাহের প্রতি ইঙ্গিত করে' যাঁরা তাঁর চরিত্রের কলুষ প্রতিপন্ন করতে যত্নবান্, আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁরা একথাও স্বীকার করেন যে তিনি তাঁর এই পত্নী ও তাঁর গর্ভজাত সন্তানদের সম্মানিত জীবন-যাপনের পথ চিরদিন সুপ্রশস্ত রেখেছিলেন। মানুষের চরিত্রের বিচার এত হাল্কাভাবে করতে যাওয়া হাস্যকর, বিশেষ করে' প্রতিভাবানের চরিত্রের বিচার। আর রামমোহনের রচিত অমর সাহিত্য বিদ্যমান থাকতে একজন সাহিত্যিক তার সাহায্যে তাঁর চরিত্রের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনের চেষ্টা না করে' সে-চেষ্টা করছেন শুধু ক্ষণভঙ্গুর ঐতিহাসিক তথ্যের সাহায্যে, এ-দৃশ্য শোচনীয়। রামমোহনের সমসাময়িক জীবন-ধারার প্রভাব যদি তাঁর

জীবনে পরিলক্ষিত হয় তবে তাঁর মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং এক হিসাবে বাড়ে, কেননা, সেই পরিবেশ অতিক্রম করে' অনেক উঁচুতে তিনি উঠ্‌তে পেরেছিলেন।

২। তিনি রামমোহনকে হিন্দু-সাধক বলে' স্বীকার করতে রাজি নন। এ-মত সানন্দে তিনি পোষণ করতে পারেন। মহাত্মা গান্ধীর মতো হিন্দুকেও কোনো কোনো পণ্ডিত বলছেন অহিন্দু। বোধ হয় সব সম্প্রদায়ের বিচক্ষণেরাই চিরদিন তাঁদের শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের এই ভাবে অপমান করে' এসেছেন। কিন্তু চিন্তাশীল হিসাবে একথা তাঁর মনে স্থান দেওয়া উচিত যে এ-মত সর্ব্বজনগ্রাহ্য নাও হতে পারে। হিন্দু-সাধনায় monotheism নাই monism আছে এই এক কথায় হিন্দু-সাধনার মতো একটি বিরাট ও জটিল ব্যাপার যদি তিনি বুঝে ফেল্‌তে চান তবে তাঁর সে-চেষ্টাকে প্রশংসার্হ বল্‌তে আপত্তি না থাক্‌তে পারে, কিন্তু তাঁকে সত্যদ্রষ্টার মর্য্যাদা দেওয়া সহজ হয় না। monotheism আর monism (একেশ্বর-বাদ ও একত্ব-বাদ) যে পরস্পর-বিরোধী নয়, বরং সাধনার ক্ষেত্রে এ হয়ত একই ঘরের এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাবার মতো ব্যাপার, সে-তত্ত্বের কিছু সন্ধান পাওয়া যায় ইসলামের ইতিহাসে। ইসলাম monotheistic একথা সবাই জানেন, সেই ইসলাম-বৃক্ষের এক অমৃত-ফল monism-বাদী মৌলানা জালালুদ্দিন রুমি—সর্ব্বসাধারণ মুসলমান ও আধুনিক বিশেষজ্ঞদের এই মত। তা ছাড়া স্যর রাধাকৃষ্ণন্‌-প্রমুখ দার্শনিকদের লেখায় হিন্দু-সাধনার যে-রূপ ফুটেছে তা দেখে মনে হয়, গভীর জ্ঞান ও গভীর অজ্ঞানতাপূর্ণ যুগযুগান্তের হিন্দু-সাধনার (মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি সব প্রাচীন সাধনা সম্বন্ধেই একথা তুল্যরূপে প্রযোজ্য) যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ আধুনিক কালে তার পর্য্যাপ্ত পরিচয় রামমোহন-সাহিত্যেই

আছে। ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও গান্ধী হিন্দুসাধনা সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন মানুষের জন্য তা কম মূল্যবান্ নয়; কিন্তু জীবনের বহুভঙ্গিমতা ও ক্রমোৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি রেখে এঁদের কথার মর্য্যাদা নিরূপণ করতে গেলে মনে হয়, হিন্দু-সাধনা সম্বন্ধে রামমোহনের পথনির্দ্দেশই বেশী মূল্যবান্, কেননা এঁদের চাইতে রামমোহনের মনীষা শ্রেষ্ঠতর, আর শুধু হিন্দুর নয় অন্যান্য সম্প্রদায় ও জাতির মানুষেরও তিনি বেশী আত্মীয়। সৃষ্টিতে একক নিঃসম্পর্ক বা অপরিবর্ত্তনীয় কিছুই নাই। সে-ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি নামে মানুষ যে কোনো এক কালে পরিচিত হয়েছিল এইই তার চিরকালের পরিচয় এ-চিন্তার পরিসর এত ক্ষুদ্র যে একে অসত্য বলা যেতে পারে। যা আছে শুধু তাইই সত্য নয়, যা হওয়া উচিত মানুষের জন্য তাইই বিশেষভাবে সত্য—তা সে-সত্যের উপলব্ধিতে মানুষের যত দীর্ঘকালই ব্যয়িত হোক। বাংলার বুকে হিন্দু আর মুসলমান এই দুই প্রতিবেশী আজ প্রেমহীন নিঃসম্পর্কতায় বিরাজমান। এ সত্য। কিন্তু এ-সত্য যদি চিরন্তন হয় তবে মানুষের জীবনের মতো এমন একটি শোচনীয় ব্যাপার জগতে আর নাই।

৩। তিনি বলেছেন, রামমোহনকে ধার্ম্মিক বলা যায় না; অন্য কথায়, তাঁর প্রতিভা ধর্ম্ম-প্রতিভা নয়। ধার্ম্মিক কাকে বলা যায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়, কেননা ধার্ম্মিকদের মধ্যে আস্তিক, নাস্তিক, সংশয়-বাদী, সাকার-বাদী, নিরাকার-বাদী সবাই আছেন। তবে হয়ত এঁদের সবারই সাধারণ লক্ষণ—কোনো-এক সত্যে সমর্পিত-চিত্ততার ভাব। এই সমর্পণ কি রামমোহনে নাই? বরং সংকীর্ণচিত্ত ও অপূর্ণাঙ্গ-মস্তিষ্ক সাধু-সন্ন্যাসীর চাইতে দেহ-ও-মনের অপূর্ব্ব-স্বাস্থ্য-সমন্বিত রামমোহনে সত্য ও মানব-কল্যাণের উদ্দেশ্যে সমর্পিতচিত্ততা

পরম মনোজ্ঞ হয়েই ত প্রকাশ পেয়েছে! রবীন্দ্রনাথ থেকে রম্যাঁ রলাঁ্যা পর্য্যন্ত যাঁরা রামমোহনের প্রতিভার মাহাত্ম্য উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন তাঁরাই তাঁর ভিতরকার এই শক্তি ও শান্তি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। রামমোহন তাঁর রচনায় বারবার এক ঈশ্বরের কথা বলেছেন, এতেই যে তিনি ধার্ম্মিক পুরুষ তা নয়। কিন্তু এই ঈশ্বর তাঁর কাছে একটি শব্দ বা সংস্কার মাত্র নয়। এই ঈশ্বরের উপলব্ধি-চেষ্টাই তাঁর কাছে সমস্ত রকমের মানসিক জড়তা পরিহারের উপায়-স্বরূপ। রামমোহনের ঈশ্বর একদিকে অবাঙ্‌মানসগোচর নিশ্চয়ই, কিন্তু তিনিই আবার তাঁর নিজের ও বিশ্ব-মানবের "সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা"— সদাজাগ্রত। সত্য ও কল্যাণের প্রেরণায় এমন চির-অনুপ্রাণিত প্রতিভাকে ধর্ম্ম-প্রতিভা না বলা কেবল মধ্যযুগীয় মনোভাবের পক্ষেই তেমন অশোভন নয়!

৪। রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তারও বিশেষ মূল্য নাই, এও তাঁর মত, কেননা তাঁর মতে সে-চিন্তা আহৃত চিন্তা, মৌলিকত্ব তাতে নেই। তাঁর জানা উচিত যে আমাদের দেশের কোনো কোনো শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে ঐতিহাসিক-সত্য-নিরূপণ, রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি ও পুষ্টি, ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক চিন্তা রামমোহনের রচনায় বিদ্যমান রয়েছে। আর আহৃত চিন্তা মাত্রই যে অকিঞ্চিৎকর তা নয়। অনেক সময়ে আহৃত চিন্তাও নূতন চিন্তা, কেননা, নূতন পরিবেশের প্রয়োজনে তার জন্ম। তা ছাড়া রামমোহন সম্বন্ধে এই বড় কথাটা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে তিনি পণ্ডিত যত বড়ই হোন সে-পাণ্ডিত্য তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর চারপাশের লোকদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার মীমাংসায়। এই যে শুধু পণ্ডিত না হয়ে কাজের লোক হবার দিকে তাঁর বেশী ঝোঁক এরই ফলে তাঁর

পরবর্ত্তী রাজনৈতিক স্বাপ্নিকদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই দিনে তিনি বলেছিলেন, জমিদারের সঙ্গে যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়েছে প্রজার সঙ্গেও তাই করা হোক—বর্দ্ধিত কর-ভারের চাপে প্রজার প্রাণ যে ওষ্ঠাগতপ্রায়। আজো আমাদের দেশের ক'জন রাজনীতিজ্ঞ দেশের এই ধরণের সমস্যা এমন সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারেন তাই ভাববার বিষয়। এবারকার শতবার্ষিক অনুষ্ঠানসমূহে রামমোহনের ভাববিলাসবর্জ্জিত স্বদেশপ্রেমের গভীরতা যে অনেকের আলোচনার বিষয় হয়েছিল এতেই বুঝতে পারা যায়, রামমোহনের প্রতিভার মাহাত্ম্য উপলব্ধির পথেই তাঁর দেশ অগ্রসর হচ্ছে—যদিও আস্তে আস্তে।

৫। তিনি আর একটি বড় প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—রামমোহন বাংলা গদ্যের প্রবর্ত্তক কি না। তাঁর বক্তব্য, রামমোহনের গদ্য-রীতির প্রভাব বাংলা গদ্য-রীতির ইতিহাসে আদৌ লক্ষ্যযোগ্য নয়, কাজেই বাংলা গদ্যের প্রবর্ত্তক তাঁকে বলা যায় না। তাঁর একথা অনেকখানি যথার্থ বলে স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু এ-কথা বল্‌তে গিয়ে রামমোহনকে যে তিনি অসাহিত্যিক প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন এখানেই খুব বড় একটি ভুল করেছেন। সাহিত্যিক কাকে বলবো?—যিনি তাঁর মনের ভাব সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন; সুন্দর ভাষা কি?—যাতে ভাবের প্রকাশ পূর্ণাঙ্গ বা পর্য্যাপ্ত হয়েছে। রামমোহনের ইংরাজি, পার্সি এমন কি আরবী রচনায়ও যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক সৌষ্ঠব যথেষ্ট এ কথার প্রমাণ দেবার দরকার করে না। তাঁর বাংলা রচনাই অনেক বাঙালীর পক্ষে দুরধিগম্য—মনে হয় আড়ষ্টতায় ভরা। কিন্তু তাঁর ভাষা-সঙ্কেতের ভিতরে প্রবেশ করলে বুঝতে পারা যায়, তাঁর নিজের ভাষায় তাঁর

বক্তব্য সুস্পষ্ট তো বটেই, চিন্তার ঋজুতা ও সূক্ষ্মতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা ও মার্জ্জিতত্বের জন্য স্থানে স্থানে উপভোগ্যও। আমার তো মনে হয়, রামমোহনের অলোকসামান্য মানসজীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর সাহিত্যের ভিতরেই সঞ্চিত রয়েছে—যেমন অন্যান্য সাহিত্যিকের বেলায় ঘটে। ও-সাহিত্য বাস্তবিকই একটি জগৎ। প্রচলিত বাগাড়-ম্বরপূর্ণ বাংলা গদ্যের পাশে সংযত-বাক্, সারবান্, ক্ষিপ্রগতি কিন্তু অদ্ভুত. রামমোহনী গদ্য মস্তিষ্কবান্ সাহিত্যিকদের আদরের সামগ্রী। সামান্য পরিবর্ত্তনেই রামমোহনের বাংলা গদ্যের অদ্ভুতত্ব কেটে গিয়ে তা আধুনিক স্বচ্ছন্দগতি গদ্য হয়ে উঠতে পারে এটিও লক্ষ্য করবার বিষয়। আর একটি কথা। রামমোহনের বাংলা গদ্য যে নিতান্ত নিঃসম্পর্ক তাও হয়ত নয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের সঙ্গে রামমোহনের গদ্যের কিছু কিছু মিল আছে মনে হয়েছে। সমস্ত বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যঙ্গের সেই তীক্ষ্ণতায় ও মার্জ্জিতত্বে হয়ত রামমোহন রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ববর্ত্তী।

প্রতিভা ও সত্য এক কথা নয়। প্রতিভা সত্যের বাহন। তাই কোনো প্রতিভাকে বুঝতে যথেষ্ট চেষ্টা না করা আর সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো প্রায় তুল্যরূপের অপরাধ। এ-অপরাধ আরো গুরুতর হয়ে ওঠে তখন যখন সেই প্রতিভার সঙ্গে দেশ ও জাতির প্রগতির যোগ গৌণ না হয়ে হয় মুখ্য।

চৈত্র, ১৩৪০

## ছিন্নপত্র

# জ্ঞান ও প্রেম

……আপনি ভারতের জন্য চান জাতীয়তা-বোধ ও বিচার-পরায়ণতা, Nationalism ও Rationalism. আমাদেরও দেশের জন্য যা কামনা তার হয়ত খুব বড় কথাটাই এই। তবু আমি হচ্ছি মোটের উপর একজন সাহিত্যিক—সংস্কারক ঠিক নই। সংস্কারের বীজ হয়ত আমার বা আমাদের লেখার ভিতরে আছে, কিন্তু আসলে, জীবনের এক নূতন অনুভূতির প্রকাশ, এই-ই হয়ত আমাদের সমস্ত চেষ্টার মূল কথা। একালের ভারতবাসী আমরা, মুসলমান-সমাজে জন্মেছি, সেই নানা বন্ধনে বদ্ধ মানুষ কেমন করে' স্বাভাবিক মানুষের পর্য্যায়ে উন্নীত হতে পারে, মনে হয়, তাই হয়ত একটুখানি ফুটেছে বা ফুটতে চাচ্ছে আমাদের লেখায়।—কিন্তু আপনি হচ্ছেন রাষ্ট্রের সাহায্যে সংস্কারের খুব পক্ষপাতী, আপনি বিশ্বাস করেন যে সেই ভাবেই ভারতের জাতীয় জীবন অর্থপূর্ণ ও উন্নত করা যাবে, এক কথায়, জাতীয়তা-বাদী ও বিচার-বাদী ভারত গড়ে উঠে' আধুনিক ইয়োরোপের মত বলবীর্য্য ও সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন হবে। আপনার বা আপনাদের এই আশায় বাদ সাধা আমাদের উদ্দেশ্য ত নয়-ই, বরং এ-ব্রতে সত্যই যদি আপনারা ব্রতী হন তবে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতিই পাবেন; কিন্তু তারই সঙ্গে শুধু এই কথাটুকু বলতে চাই, "আমাদের ইয়োরোপের মতো হতে হবে" এই ধরণের চিন্তার ভিতরেই একটি বড় ত্রুটি রয়েছে, তার নাম দেওয়া যেতে পারে ব্যস্ততা, অর্থাৎ কিছু অন্ধতা। ইয়োরোপের মতো হতে চান, বেশ, কিন্তু কেমন করে'

হবেন ? তার যে কতকগুলো সামাজিক ও কৃষ্টিগত বিধি-বিধান সে-সবের হুবহু প্রবর্ত্তনা করলেই কি সব হবে ? তাই যদি হতো তা'হলে ইয়োরোপের সকল দেশের ও আমেরিকার চিত্তোৎকর্ষ এক হতো। কিন্তু বাস্তবিকই সে-সব এক নয়, এক রকম দেখালেও ভিতরে ভিতরে যথেষ্ট পার্থক্য। আমি এ-সব দেশের মাত্র সাহিত্যের সঙ্গে কিছু পরিচিত, কিন্তু দেখেছি, সেই সাহিত্যে বিভিন্ন জাতীয় বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট প্রস্ফুট, অনেক সময়ে পড়লেই বুঝতে পারা যায় কোন্ দেশের সাহিত্য পড়ছি। আপনি বলেছেন, প্রাচ্যের অতীত মরে' ভূত হয়ে গেছে, পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞতার উপরে আমাদের নির্ভর করতে হবে ; কথাটা বেশ সাহস করে বলা, আর অনেকখানি সত্যও এই জন্য যে কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সব দেশের ইতিহাসই মানুষের ইতিহাস, তাই পাশ্চাত্যের ইতিহাসকে যদি নিজের ইতিহাস বলে' মনে করেন, তবে অসঙ্গত বা অন্যায় কিছুই করা হবে না। কিন্তু আপনার কথার ত্রুটি এইখানে যে বাস্তবিকই প্রাচ্য মৃত নয়, মৃত হলে হিন্দু-মুসলমান-বিরোধ অমন জম্‌ত না। এ'কে মৃত বলে' যদি অস্বীকার করে' চলতে চান তবে পদে পদে যে-প্রতিবন্ধকতা পাবেন তাই আপনাকে জানিয়ে দেবে যে যাকে মনে করেছেন মৃত সে মৃত নয়। আসল কথা, আমাদের দেশের যে বর্ত্তমান অবস্থা ইয়োরোপকেও এক সময়ে সে-অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে, এমন কি এখনো সেখানে যে ভারতের মতো অজ্ঞতা বা কুসংস্কার নাই তা নয়। তবে জ্ঞানের একটা প্রবল স্রোত সেখানে বইছে, তাই কোথায় কি আবর্জ্জনা আছে তার উপরে তেমন চোখ পড়ে না। আপনি বলবেন, প্রবল রাষ্ট্র-জীবনই হচ্ছে সেই প্রবল স্রোত যা দেশকে সজীব ও সতেজ রাখে। আপনার কথার প্রতিবাদ করতে চাই না, শুধু এই কথাটুকু বলতে চাই, ইয়োরোপে আজ রাষ্ট্রের যে

ক্ষমতা দেখছেন আগেও কি এই-ই ছিল? ইয়োরোপে যখন ধর্ম্ম-দ্রোহিতার জন্য মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে তখন রাজশক্তি অথবা জনসাধারণ কি তার পৃষ্ঠপোষকতা করে নাই? আমাদের এই ভারতেও আজ যদি রাজশক্তি দেশের লোকের হাতে আসে তা'হলে গোরক্ষণ, মন্দির ও মসজিদ রক্ষণ ইত্যাদি সংক্রান্ত আইন পাঁশ করবার দিকেই রাজনৈতিক নেতাদের খেয়াল বেশী জাগবেনা কি?

যাকে বলা হয় Initiative (প্রবর্ত্তনা) তা রাজশক্তির দ্বারা না হয় তা নয়; কিন্তু তবু এ সত্য যে, বহুদিন ধরে দেশের লোকের মন তৈরি হওয়া চাই, তার পর চলতে পারে রাজশক্তির কাজ। অর্থাৎ কোনো নতুন বিষয়ে সত্যকার প্রবর্ত্তনা আসে ব্যক্তির কাছ থেকে; বহুদিন সে হয়ত নির্য্যাতন প্রতিবন্ধকতা এ-সবই ভোগ করে, তারপর দশ জনের কাছে সে-কাজের কদর হয়। আজকাল শিক্ষা সার্ব্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা দেশে দেশে রাজশক্তির এক বড় কাজ হয়েছে, কিন্তু এর পেছনে রয়েছে কত শতাব্দীব্যাপী কত মহাপুরুষের অশেষ লাঞ্ছনা-ভোগ!

অবশ্য আপনি মনে করবেন না, আমি রাজশক্তির সাহায্যে সংস্কার-চেষ্টা অসম্ভব মনে করি। নিশ্চয়ই তা অসম্ভব নয়। কিন্তু যত দ্রুত ফললাভ আশা করেন, বলতে চাই, তা সম্ভবপর নয়। রাজশক্তি খুব বড় শক্তি হলেও মানুষের সমাজ-জীবনের একটি শক্তি, তার অন্যান্য শক্তি সক্রিয় না হলে রাজশক্তি কার্য্যকরী হতে পারে না।

তাঁছাড়া আমাদের দেশে সেই রাজশক্তিকে কার্য্যকরী করাই তো এক বিরাট সমস্যা। ভিতরের ও বাহিরের কত প্রতিবন্ধকতা তাতে! সেই সব প্রতিবন্ধকতার শক্তি হ্রাস করবার কিছু ক্ষমতা সাহিত্যের আছে, কিন্তু সে Propagandist-সাহিত্যের নয় সত্যকার

সাহিত্যের। Propagandist (বিশেষ-উদ্দেশ্য-মূলক) সাহিত্য হচ্ছে এক শ্রেণীর চেঁচামেচি ; চেঁচামেচি শুনে কখনো কখনো ভ্রম হতে পারে হয়ত ভয়ানক আয়োজন চলেছে, কিন্তু আসলে ফাঁকি। সত্যকার সাহিত্য কি ? যা ব্যক্তি-বিশেষের সত্যকার দুঃখ-আনন্দের প্রকাশের ফল—

কত প্রাণপণ দগ্ধ হৃদয় বিনিদ্র বিভাবরী—
জানো কি বন্ধু উঠেছিল গীত কত ব্যথা ভেদ করি !

এ ফরমাসে গড়া যায় না। এর জন্য অপেক্ষা করতে হয়, আর পেলে তার যত্ন করতে হয়। পুষ্টিকর খাদ্য যেমন মানুষের সমস্ত দেহ সক্ষম ও সুন্দর করে তোলে তেমনিভাবে সত্যকার সাহিত্যের প্রভাবে অনেকটা অজ্ঞাতসারে মানুষের মানস-লোক সুন্দরভাবে গড়ে ওঠে। যে-জাতির ভিতরে সেই মানস-লোক গড়ে ওঠে নাই তার রাজশক্তির সাহায্যে কতকগুলো বিধি বিধান পাশ করিয়ে নিয়ে জগৎ-সভায় সুদর্শন হ'বার চেষ্টা অসার্থক বা অবাঞ্ছিত বল্‌ব না, তবে আমার জন্য এ-সাধনা নয়। আপনি হয়ত বলবেন, রাষ্ট্র না হলে সেই বড় সাহিত্য গড়বার ভূমিকা পাওয়া যাবে কোথা থেকে ? এ যদি বলেন তবে আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করব, তবু বল্‌ব, সত্যকার সাহিত্যিকেরর দেশ সব সময়ে তার চারপাশের দেশই নয়।

যাঁরা বলেন, আমাদের দেশকে সত্যকার মানুষের দেশ করবার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে দেশের রাজশক্তিকে বিশেষভাবে কার্য্যকরী করা তাঁরা আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ; আগে ধর্ম্মের যে স্থান ছিল বর্ত্তমানে রাষ্ট্র তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে বা হতে যাচ্ছে এবং এইই সঙ্গত এও আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি, কোনো রকমের অভিজাত-তন্ত্র আমি চাই না, জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণ হোক এই আমার

কাম্য. তাই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও গণতন্ত্র আমার শ্রদ্ধার সামগ্রী,—তবু আমি রাজনীতি-বিশারদদের দলের নই, মুক্তিপথের যাঁরা পথিক তাঁদেরই একজন নগণ্য অনুচর। মানুষের জন্য দারিদ্র আমি চাই না, যাকে বলা হয় সমৃদ্ধি তাই-ই আমি চাই—তবু জানি, মানুষের সকল সমৃদ্ধির উপরে জ্ঞান ও প্রেম। মনে হয় এখানেই আপনার সঙ্গে আমার পার্থক্য। তা থাক্‌না পার্থক্য। আপনার যে-প্রোগ্রাম তাই-ই অনুসরণ করে চলুন। দেশের ভবিষ্যৎ কি তা কে জানে ? যা সত্য বলে' জানি, কল্যাণকর মনে করি, তাই-ই আমার করণীয়। God does his business do yours ( তাঁর কাজ তিনি করছেন তোমার কাজ তুমি কর ), এর বেশী ভার আমার জন্য নয়।

আপনার যে-প্রোগ্রাম (কর্ম্ম-ধারা) তার মূল উদ্দেশ্যটীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বুঝতেই পারছেন, কিন্তু এর ভিতরে এমন কতক-গুলো কথা আপনি ব্যবহার করেছেন যাতে বোঝা যায়, কতকগুলো ঐতিহাসিক ব্যাপারের যথাযথ মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য চেষ্টা আপনি করেন নাই। যেমন রামমোহন ও মির্জ্জা গোলাম আহ্‌মদকে এক পর্য্যায়ে ফেলেছেন, যদিও তাঁদের একজন revealed book-এ (প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থে) বিশ্বাস করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মনে করতেন, অপরজন করতেন না। তা ছাড়া তাঁদের চেষ্টায় কোনো সত্যকার ফল লাভ হয় নাই, এ বলা অত্যন্ত হাল্কা কথা বলা। আপনি বিচার-বুদ্ধির পক্ষপাতী, কিন্তু সেই বিচার-বুদ্ধি কি বলে না যে, মানুষের অবলম্বন শুধু বিচার-বুদ্ধি নয়, বরং তার বিচার-বুদ্ধি অনেক-কিছুর অপেক্ষা রাখে ? আপনার কর্ম্মধারার ত্রুটি এই যে, বিরুদ্ধ-শক্তি যে কত বড় শক্তি তা আপনি খুব কমই ভেবেছেন। এ কিন্তু কর্ম্মীর লক্ষণ নয়। যে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিত্ব করতে চায় তার খুব বড় কাজ হচ্ছে বিপক্ষের শক্তি রীতি-নীতি ইত্যাদি

সম্বন্ধে ওয়াকিফ-হাল থাকা। অবশ্য enthusiasm (উৎসাহের প্রাচুর্য্য) খুব বড় কথা, কিন্তু শুধু প্রচুর উৎসাহের সাহায্যে কাজ করতে চেষ্টা করা মন্ত্রশক্তির উপরে নির্ভর করারই মতো।

প্রাচীন ভারত বা প্রাচীন ইস্‌লামের চাইতে আমিও বর্ত্তমান ইয়োরোপকে বেশী শ্রদ্ধা করি, তবু, আমাদের ইয়োরোপকে অনুকরণ করতে হবে, একথা বলতে রাজি নই এই জন্য যে তাতে আমাদের অন্তর্নিহিত সৃষ্টিশক্তি ( creativeness ) হয়ত কিছু বাধা পাবে। ইয়োরোপ আজ বরেণ্য হয়েছে নানা ঘাত-প্রতিঘাত নানা দুঃখ-বিপত্তি বিপুল জ্ঞান-সাধনা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে সে এসেছে বলে। আমাদের জন্যও তাইই পথ। আমাদের যত রকমের মানসিক দৈন্য সব দূর করতে চেষ্টা করতে হবে, মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির জন্য প্রাণপণ সাধনা করতে হবে---সেই হচ্ছে আমাদের জন্য সত্যকার উন্নতির পথ। শুধু এই ভাবে চল্‌লেই ইয়োরোপের অনুবর্ত্তিতাও আমরা বিচার-পরায়ণ হয়ে করব। অর্থাৎ ইয়োরোপের কোনো আচার-পদ্ধতি গ্রহণ করব ইয়োরোপের জিনিষ বলে' নয় আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় বলে'। মানুষ বিচার-বুদ্ধির পথে চল্‌লে কত বড় হতে পারে বর্ত্তমান ইয়োরোপে তারই সূচনা হয়েছে ; ইয়োরোপের এই সাধনা সমস্ত মানুষেরই সাধনা, নানা ভাবে এ-কে পরিমার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করে চলা এই-ই বিভিন্ন দেশের সাধকদের কাজ। কিন্তু ইয়োরোপের অনুকরণ করতে হবে এ-কথা বল্লে মানুষের সেই অনন্তের অভিসারী সৃষ্টি-শক্তির প্রতি অবমাননা দেখানো হয়।

এই অনুকরণ করার কথা বলায় অসুবিধাও ঢের। মানুষকে অনুকরণ করতে বল্লে মোটেই তাকে বেশী উৎসাহিত করে তুলতে পারা যায় না, আর অনুকরণের পথ সোজা মনে হলেও বাস্তবিকই

সোজা নয়। ইয়োরোপের কি নেবেন, কার্য্যক্ষেত্রে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হলেই 'পরিবেশ' ইত্যাদির কথা ভাবতে হবে।

আপনি 'ধর্ম্মে'র উপর খুব চটা, বুঝতে পারা যাচ্ছে। 'ধর্ম্মালুতা' 'অটল বিশ্বাস' এসব সিংহাসনচ্যুত করতে মোটেই আমার আপত্তি নাই। তবু একটি কথা ভাববার আছে। ধর্ম্মের আনুষ্ঠানিক অংশ বাদ দিলেও যাকে বলা হয় 'ধর্ম্ম-ভাব' তাকে বাদ দেওয়া যায় না, কেননা সেই ধর্ম্মভাবের অর্থ হচ্ছে জীবনকে গভীরভাবে নেওয়া, মানুষের বা জগতের প্রতি প্রেম-পরায়ণ হওয়া,—এ না হ'লে কর্ম্মশক্তিই তো জাগে না। এ দিক দিয়ে দেখ্‌লে অনেক নাস্তিকও ধার্ম্মিক। টলষ্টয় ধর্ম্ম-বোধের খুব সুন্দর এক সংজ্ঞা দিয়েছেন—Religious perception is nothing else than the first indication of that which is coming into existence, namely, a new relation of man to the world around him—What is art ?—

'প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য' ইত্যাদি আপনি চান না। বেশ। যাঁরা বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য ব্যস্ত তাঁদের চাইতে আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে আমার যোগ বেশী ; তবু বলি, বৈশিষ্ট্য চাইবার বা না চাইবার জিনিষ নয়, ও আপনিই হয়, যেমন এক পিতামাতার সন্তানও এক চেহারার হয় না। চাষীর কাজ জমি ভাল করে চষা ও ভাল বীজ ছড়ানো, তারপর সোনার ফসল ফলে। আমাদেরও কাজ, সমস্ত মোহ ( প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সব মোহ ) থেকে যথাসম্ভব মুক্ত হয়ে সত্য ও কল্যাণের বীজ দেশে ছড়ানো। তারপর ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য হবে কি না সেটি নিয়ে মাথা ঘামাতে অন্ততঃ আমি নারাজ। হয় হবে, না হয় না হবে। তবে সৃষ্টি বিচিত্র—হওয়াই সম্ভব।

আপনি 'মোল্লা-পুরোহিতে'র নিশ্চিহ্ন ধ্বংস চেয়েছেন। কিন্তু চাইলেই কি ধ্বংস হয়? আমি বলি, দেশে জ্ঞানের দীপ জ্বলুক, সে-আলোর সামনে মোল্লা-পুরোহিত যদি তিষ্ঠোতে না পারে, ভাল, পারে, তাতেও আপত্তি নাই। আপনি যাকে বলেছেন মোল্লা পুরোহিত সেটি আসলে আমাদের দেশের বহু-বিস্তৃত অজ্ঞতার পরিচয়-চিহ্ন। কতকগুলো মোল্লা-পুরোহিত না হয় কোতলই করলেন, কিন্তু যে-অজ্ঞতার জলাভূমিতে মোল্লা-পুরোহিত গজায় তার ধ্বংস যদি না করতে পারেন তবে মোল্লা-পুরোহিতের উপরে খাপ্পা হয়ে লাভ? কিন্তু মানুষের সেই অজ্ঞতা দূর করা সোজা কাজ নয়, এক দিনের কাজ ত নয়ই।

তবু আপনাদের মোল্লাদের বিরুদ্ধে প্রচার আমি অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখি না। বেশ, করুন। শুধু এই বলতে চাই, ওতে বেশী কাজ হবে না, অথবা ও-কাজ করবার সামর্থ্য বা প্রবৃত্তি আমার নাই। মোল্লাদের বিরুদ্ধে প্রচারের চাইতে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার উৎকর্ষ বিধান করতে আপনারা যদি আগুয়ান হন তবে আমার বেশী সহানুভূতি পাবেন।

আমার বিরুদ্ধে আপনি হয়ত এই বড় অভিযোগটি আনতে পারেন যে আমি মানুষের ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ কাজের ধারার প্রতি অশ্রদ্ধা জানিয়ে প্রকারান্তরে নিষ্ক্রিয়তাই সমর্থন করছি। কিন্তু এ আমার বিরুদ্ধে সত্য অভিযোগ হবে না এই জন্য যে, আমিও জানি —কাজ মাত্রই ভুলভ্রান্তি-পূর্ণ, তবু সেই ভুলভ্রান্তিপূর্ণ কাজের ভিতর দিয়েই মানুষের সত্যকার কল্যাণের পথ। আপনাদের কাজের ধারা পূরোপূরি আমার মনঃপূত নয় এইজন্য যে, আপনারা ভুলভ্রান্তি এড়িয়ে চলবার জন্য যথেষ্ট অনুরাগ দেখাচ্ছেন না। মানুষ ভুল খুবই করে সেই জন্যই সে নিন্দনীয় নয়, কিন্তু নিন্দনীয় তখন যখন সত্যকে জানবার জন্য বরণ করবার জন্য আগ্রহ তার কম।

ত্রুটি সকলেরই আছে, তবু যদি কারো ভিতরে আমরা দেখি কিছু পরিমাণ সাধনা, কল্যাণের পথে চলবার আগ্রহ, তাতেই আমাদের আনন্দিত হবার কারণ ঘটে।

শুধু আমার প্রার্থনা—আপনার বা আপনাদের এই চলবার সঙ্কল্প প্রবল হোক, সক্রিয় হোক। মতামত মানুষের খুব বড় জিনিষ নয়, বড় জিনিষ হচ্ছে সেই মতামত সার্থক করবার জন্য তার আয়োজন, কেননা, সেই আয়োজনেই ফুটতে পারে তার ব্যক্তিত্ব—আর এই ব্যক্তিত্ব থেকেই রূপ পায় সব মতামত; নইলে, মতামত কথামাত্র।

১৩৩৭

# দিদারুল্‌আলম-স্মৃতিবার্ষিকী

…·এবারকার স্মৃতি-সভায় যোগদান করা বাস্তবিকই আমার পক্ষে সম্ভবপর হ'লো না। সেজন্য দুঃখ করে' লাভ নাই; বাইরের ঘটনার উপরে আমাদের কতটুকুই বা হাত। কিন্তু আমাদের পরমপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় দিদারুল আলমের স্মৃতি-উৎসবের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের একজন, এ-কথাটি বিস্মৃত হবেন না।

উৎসব কথাটি ইচ্ছা ক'রেই ব্যবহার করেছি। মৃতের স্মরণে শোকের নব-উদ্রেক—সে তো স্বাভাবিক; সেই শোকে মাতা-ভগিনীর যে বেদনা-কাতর মুখচ্ছবি মানব-জীবনে সে হয়ত এক 'রহ্‌মত'; কিন্তু নব যৌবনে মৃত্যুর কারণে আমাদের বন্ধুর লাভ হ'য়েছে চির-যৌবন, ব্যাধি দুঃখ আজ সে-যৌবনে নিশ্চিহ্ন. সে-যৌবন শুধু আশা ও সাহসের এক অফুরন্ত উৎস। যতক্ষণ আমাদের দেহে-মনে যৌবন প্রজ্জলিত, সৌন্দর্য্যে আনন্দ, দুঃখে অভয়, ক্ষতিতে সাহস যতক্ষণ আমাদের জন্য সত্য, ততক্ষণ মৃত্যু-লাঞ্ছিত দিদারুল আমাদের জন্য শোকাবহ নন প্রাণবহ—জরা ও জীর্ণতাভরা পরিবেষ্টনে আশা ও অভয়ের মূর্ত্তি—এরই নাম তো উৎসব।

চট্টগ্রাম দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, আর সে-দেশ আমার ভালো লেগেছে। আরো ভালো লেগেছে তার বুকের মানুষগুলো। জীবন তাদের জন্য এখনো যেন অনেকখানি সরস ও স্বাভাবিক. তত্ত্বের ঢাকায় রূপহীন বর্ণহীন হয়ে পড়ে নাই। দিদারুল আলম সেই পার্ব্বতী চট্টলার এক অকুতোভয় সন্তান। চট্টগ্রামের আরো কয়েকজন প্রাণবন্ত ব্যক্তির পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। মনে হয়,

জীবনের আস্বাদ চট্টগ্রাম যেন বাংলাকে কিছু কিছু শেখাতে পারবে।

আজকার দিনে যাঁরা দিদারুলকে বিশেষভাবে স্মরণ করতে চান তাঁদের প্রত্যেকেরই জন্য সত্য হোক তাঁর জীবনের মর্ম্মকথা। তিনি ধর্ম্ম বলতে বুঝতেন সমস্ত মানুষের কল্যাণ, আর কর্ম্ম বলতে বুঝতেন জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমস্ত দেশবাসীর মঙ্গল-সাধন। আজ আমাদের এই অন্ধ ও ভীরুর দেশে সত্য হোক আমাদের এই লোকান্তরবাসী বীরের অকুণ্ঠিত কল্যাণ জিজ্ঞাসা – যে-কল্যাণজিজ্ঞাসায় তিনি পণ করেছিলেন তাঁর জীবন ও যৌবন। দেশের যে-সমাজে তিনি জন্মেছিলেন সে-সমাজ আজো দিশাহারা—হয়ত বৃহত্তর দেশও দিশাহারা। কিন্তু সেটি বাস্তবিকই তেমন ভাবনার কথা নয়। বৈজ্ঞানিক তাঁর ক্ষুদ্র কক্ষে বসে যদি তাঁর অনুসন্ধানে সফলকাম হতে পারেন তবে তিনি জানেন, সমস্ত জগতের ভ্রমান্ধকারের পাশে তিনি স্থাপন করতে পেরেছেন জ্ঞানালোকের কণিকা; সামাজিক কর্ম্মীও তেমনিভাবে যদি নিঃসন্দেহ হতে পারেন তাঁর অন্তরের প্রেম ও কল্যাণ-চিন্তা সম্বন্ধে তা হলে জগতের বিপুল দুঃখ-ব্যর্থতার সমুদ্রে এতটুকু অবলম্বন মানুষের জোটে। "A good man is a great man" ( সদাশয় যিনি তিনি মহান ) কথাটি সত্য।

আজকার স্মৃতি-বাসরে আমাদের সবারই চিত্ত সত্যের প্রতি ও মানুষের প্রতি প্রেমে উদ্বুদ্ধ হোক, অন্যায় ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে চির-সংগ্রামে নূতন তেজ লাভ করুক, এই প্রার্থনা করি।

২৮ ডিসেম্বর, ১৯৩০

# বিপ্লব

...হঠাৎ দেরাজের ভিতর থেকে তোমার একখানি পেন্সিলে-লেখা বড় চিঠি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তার তারিখ ১৬-৮-৩১। তার কি উত্তর তখন দিয়েছিলাম, মনে পড়ছে না। কিন্তু চিঠিখানিতে এমন দু'টি বড় সমস্যার প্রতি তুমি ইঙ্গিত করেছ যার আলোচনা বারবার করাও সঙ্গত বৈ অসঙ্গত নয়।

আমার যে মত, বিপ্লব মানুষের সমাজের এক ব্যাধি সুতরাং মানুষের জন্য কাম্য নয়, তোমারও ধারণা হয়ত এইই; তবু Wordsworth-এর মতো লোকও তাঁর Prelude কাব্যে Residence in France নামের পরিচ্ছেদগুলোয় বিপ্লবের স্তুতি অনেকখানি গেয়েছেন এতে তোমার একটু খট্‌কাও লেগেছে।

কোনো মতামতই হয়ত খুব জোর ক'রে দেওয়া যায় না—তাতে শুধু জোর-প্রকাশের সম্ভাবনাই বেশী। মানুষের মতামত তার ব্যক্তিগত নীতিরুচি শিক্ষাদীক্ষা ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে জড়িত যে তাকে এক সনাতন সত্য ব'লে প্রচার করা বাস্তবিকই বিপজ্জনক। কিন্তু ব্যক্তিই তো হচ্ছে সমাজের আত্ম-প্রকাশের এক একটি উৎস-মুখ, তাই যে-সব মতামত ব্যক্তির অন্তরতম কথা সে-সবের যথাযোগ্য রূপ দিতে চেষ্টা না করাও সমাজেরই প্রতি ব্যক্তির এক মহা অপরাধ।

বিপ্লব কা'কে বল্‌বে? ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠল—এ তো জগতের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু যে-বিপ্লব বিপ্লবীদের কামনার ধন, এ তা নয়। বিপ্লবীরা মোটের উপর চান

বিশৃঙ্খলা। চারদিকের এই বিরাট ভাঙার ভিতরে তাঁদের মাথা ঠিক থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, কিন্তু সেইটী বিপ্লবের বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে সর্ব্বত্র একটী বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি, আর তাঁরা বিশ্বাস করেন, সেই বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে এক সুন্দরতর ভবিষ্যতের জন্মলাভ হ'বে। বিপ্লবীরা এক ধরণের mystic—realistic (সত্যাশ্রয়ী) তাঁরা যত তার চাইতে mystic ( দুর্জ্ঞেয়তাবাদী ) অনেক বেশী।—এইখানে বিপ্লবীর পথে আর আমার পথে এক দুস্তর ব্যবধান। এক সর্ব্বব্যাপী বুদ্ধিনাশের চর্চ্চার ভিতর দিয়ে মানুষের সমাজের কোনো শ্রেয়োলাভ হ'তে পারে এ-তত্ত্ব আমার জন্য বাস্তবিকই দুরধিগম্য।

আশা করি তুমি বল্‌বে না আমি বিপ্লবের অপব্যাখ্যা করছি।

বিপ্লবের মন্ত্রদ্রষ্টা আর বিপ্লবের আয়োজন-কর্ত্তা এ দুয়ের পার্থক্য কিন্তু যথেষ্ট। বিপ্লবের মন্ত্রদ্রষ্টা মোটের উপর একজন স্বাভাবিক চিন্তাশীল মানুষ; মানুষ হাৎড়িয়ে হাৎড়িয়ে জীবনের জটিল পথে পথ খুঁজে চলে, তাঁর ভিতরেও সেই চলারই ভঙ্গিমা। বিপ্লব-কর্ত্তাকেও যে ইতিহাসের ধারায় তেমনি এক পথচারী রূপে না দেখা যায় তা নয়; তবে ভালো-মন্দের বিচার আমাদের না ক'রে ত উপায় নাই, তাই বিপ্লবের মন্ত্রদ্রষ্টা ও বিপ্লবের কর্ত্তা—সমাজের উপর এ দু'য়ের প্রভাবে যে-পার্থক্য তা আমাদের ভালো করেই লক্ষ্য করতে হয়। আমার সমস্ত অভিযোগ এই বিপ্লব-কর্ত্তাদের বিরুদ্ধে; ঠিক ঠিক বলতে গেলে, এঁদের কর্ম্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে।

অবশ্য অহিংসা ও হিংসা এ-দু'য়ের এক যোগ্য সামঞ্জস্যসাধন খুবই কঠিন ব্যাপার। তবু মনে হয়, মানুষের এতদিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও সাধনার পরও হিংসাকেই মানব-সমাজে কার্য্যোদ্ধারের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন রূপে গণ্য করলে মানুষকে পশু ভিন্ন আর কিছু তেমন মনে করা

হয় না। আর মানুষ যদি পশুই হয় তবে বিপ্লবের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধানে কিইবা প্রয়োজন!

আর একটা কথা বলতে হবে; Wordsworth যে তাঁর Prelude-এ বিপ্লবের স্তুতি গেয়েছেন এ হয়ত ঠিক নয়। Liberty'-র (স্বাধীনতার) জন্য তাঁর প্রেম অপরিসীম, এই কথাই Prelude-এ বলা হয়েছে মনে হয়। বড়জোর তিনি বিপ্লবের মন্ত্রদ্রষ্টাদের দলের। কিন্তু তিনি যে বিপ্লবের আয়োজন-কর্ত্তাদের কেউ নন্ একথা তিনি খুব বেশী স্পষ্ট ক'রে বলেছেন।

তোমার অপর কথাটীও বেশ ভাববার মতো কথা—"If you would succeed you must not be too good" যদি সফলকাম হতে চাও তবে অতিরিক্ত ভাল হয়ো না। কিন্তু সফলকাম হবে কি ভাবে? Napoleon-এর সাফল্য আর Wordsworth বা গ্যেটে বা Shelley-র সাফল্য তো এক পর্য্যায়ের নয়। আমার তো মনে হয়, কতগুলো সফলতা আছে যা লাভের জন্য অতিরিক্ত ভাল হওয়া চাই কি না বলতে পারি না, তবে ভাল হওয়া চাইই। তার উপর, যাঁরা বাস্তবিকই সফলকাম হন তাঁরা সফলতার আরাধনা করেন না। হয়ত একটু-আধটু তার কথা ভাবতে পারেন, কিন্তু সেটি নগণ্য ব্যাপার। তাঁদের আসল কাজ হচ্ছে আত্ম-নিবেদন, অসীম প্রয়াস—'taking infinite pains'—আর তাতেই তাঁদের এক নিগূঢ় আনন্দ।...

সেপ্টেম্বর, ১৯৩১

সাহিত্য

# বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারা

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনে
সাহিত্য-শাখায় প্রদত্ত অভিভাষণ।

আমাদের কোনো সাহিত্যিক এবার বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস সম্বন্ধে কোনো রচনা পাঠ করবেন কি না জানি না। কিন্তু বাস্তবিকই এ একটী বিষয় এবং এ বিষয়ে বিশেষভাবে ভেবে দেখবার সময় উপস্থিত হয়েছে। সেকালের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান সাহিত্যিকের দান নগণ্য নয়, বরং এক হিসাবে গৌরবের, অথচ একালের মুসলমানসমাজ যেন বহুদিন পর্য্যন্ত ভাবতেই ভরসা পান নাই যে তাঁদের কোনো সাহিত্যিক এমন কিছু রচনা করতে পারেন যা দেশের সর্ব্বত্র এতটুকু সমাদর লাভ করতে পারে; আর কতকটা এই দুঃখে তাঁদের কেউ কেউ ব্যবস্থা দিয়েছেন—বাংলা বাদ দিয়ে উর্দ্দুকেই বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু এবিষয়ে আপনাদের সন্তোষ সাধন করবার সঙ্গতি এখনো আমার লাভ হয় নাই। দুই একটী কথা বলে আপনাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত করতে চেষ্টা করব মাত্র।

বাঙালী মুসলমানের সেকালের সাহিত্য-চর্চ্চা প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করে দেখা যেতে পারে—অনুবাদ সাহিত্য, গাথা সাহিত্য ও মারফতী সাহিত্য।

'পুঁথি সাহিত্য' নামে যে বিরাট 'মুসলমানী' সাহিত্য আছে তা অনুবাদ সাহিত্যের অন্তর্গত করে আমরা দেখতে চাচ্ছি। বলা বাহুল্য

এই পুঁথি সাহিত্যের খুব কম গ্রন্থই অনুবাদ, অধিকাংশই পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের অনুসরণ মাত্র, কতকগুলো তাও নয়, প্রাচীন কাহিনী, কিম্বদন্তী, প্রভৃতির সংগ্রহ। এই পুঁথি সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আজও হয় নাই। আমাদের জনৈক তরুণ সাহিত্যিক পুঁথি সাহিত্যের নায়িকার রূপ-বর্ণনায় যে যথেষ্ট চটুলতা আছে তা দেখাতে চেষ্টা করেছেন। আমি নিজে এই সাহিত্যের সঙ্গে তেমন পরিচিত নই। তবে যেটুক পরিচয় লাভ করেছি তাতে খুশী হতে পারিনি আদৌ। চিন্তা, কল্পনা, রচনা, সমস্তেরই বড় বেশী দৈন্য তাতে চোখে পড়েছে। সুপ্রসিদ্ধ পুঁথি 'কাছাছল আম্বিয়া'তেও এমন কিছু পাইনি যাকে বলা যেতে পারে চিত্তাকর্ষক। অথচ বাইবেলের ওল্ড-টেষ্টামেণ্ট-এর কাহিনী চমৎকারিত্বে পরিপূর্ণ, আর কোরআনের নবী-কাহিনী গভীরভাবে আল্লাহ্‌তে সমর্পিতচিত্তদের কাহিনী, স্থানে স্থানে কবিত্বময়ও বটে। কিন্তু মনে হয় "কাছাছল আম্বিয়া"র লেখক বা লেখকগণ দৈববলের অদ্ভুতত্বে বিশ্বাসী ভিন্ন আর কিছুই নন। জীবনের মাহাত্ম্য মর্য্যাদা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা যে তাঁদের ছিল তা বিশ্বাস করতে ভরসা হয় না।—তবে একথা বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের অনেকখানি সম্বন্ধেই বলা যেতে পারে।

অনুবাদ সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান কবি আলাওলের। অন্ততঃ এই-ই অনেকের মত। তিনি প্রকৃতই পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। এতখানি পাণ্ডিত্য নিয়ে আর কোনো মুসলমান বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে লেখনী ধারণ করেন নাই। সৌন্দর্য্যবোধও তাঁর ছিল। তাঁর 'পদ্মাবতী' পড়তে গিয়ে অনেক সময়েই মনে হয় বিদ্যাপতি ও ভারতচন্দ্রের কথা। কিন্তু সত্যকার কবি হিসাবে আলাওলের স্থান এঁদের নীচে।

মোটের উপর অনুবাদ-সাহিত্য সত্যকার সাহিত্য হিসাবে তেমন

কিছু নয় বলেই মনে হয় যদিও এ-সাহিত্যের বহুল প্রচলন মুসলমান সমাজে ছিল। এই অনুবাদ সাহিত্যের চাইতে গাথা সাহিত্যে প্রাচীন মুসলমানের দান অনেক উঁচু দরের।

মুসলমানের রচিত গাথা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বোধ হয় 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র 'দেওয়ানা মদিনা'। গ্রাম্য ভাষায় এই গাথা রচিত; কিন্তু রচয়িতা সত্যকার কবি বলে তাঁর সৃষ্টি তাতে ম্লান হয় নাই। স্বামী কর্ত্তৃক অকারণে পরিত্যক্ত প্রেমময়ী কৃষককন্যা মদিনার শোকের এক মর্ম্মস্পর্শী চিত্র আঁকা হয়েছে এতে; আর মদিনার মৃত্যুতে তার এই অপরাধী স্বামীর যে বুক-ফাটা ক্রন্দনের ছবি কবি এঁকেছেন সাহিত্য-রসিকদের চোখে তা অমূল্য—সীতার বিরহে কৃত্তিবাসের রামের চাইতে চাষী-কবি মনসুর বয়াতির অঙ্কিত এই শোক গভীরতর, সুন্দরতর।

মারফতী সাহিত্য এক সুবিস্তীর্ণ সাহিত্য। মুর্শীদী গান, দেহতত্ত্ব গান, বাউল গান, এর অন্তর্গত। এই মারফতী সাহিত্যের অনেকখানিই তাত্ত্বিকতাপূর্ণ। কিন্তু এর অন্তর্গত কবিত্বময় বাউল গানের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ রচয়িতা—যেমন হাসান রাজা, মদন, লালন শাহ, শেখ ভানু—মুসলমানসমাজ-উদ্ভূত।

এই মুসলমান-বাউদের সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাদের সাহিত্যিক-দের ভাবতে হবে। এই বাউলরা কোন্ সাধনার উত্তরাধিকারী, সুফী সাধনা ও বৈষ্ণব সাধনা অথবা সুফী কবিতা ও বৈষ্ণব কবিতা এর কোনটীর প্রভাব এঁদের উপরে বেশী, এঁদের নিজস্বতাই বা কি, ইত্যাদি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে তাঁরা হিন্দু-মুসলমানের দীর্ঘ দিনের পরিচয়ের অনেক গোপন তথ্য উদ্ধার করতে পারবেন। এঁদের রচনা পড়ে আমার কিন্তু মনে হয়েছে, এঁদের ভাষায় বাংলার বৈষ্ণব কবিতার কোমলতা ও মৃদুতার চাইতে বাএজিদ বোস্তামি, হাফিজ, প্রমুখ সুফীদের

বাণীর বিদ্যুৎভঙ্গি ও দাহই বেশী ফুটেছে। তবে কেন যে এমন হয়েছে তা বলা নিশ্চয়ই সহজ নয়। সুফী-সাধনা ভারতে এসে এখানকার নানা ভাব-সাধনার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছিল, চট্টগ্রামের দরবেশ আলী রাজা ওরফে কানু ফকিরের "জ্ঞান সাগর" গ্রন্থে তার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত বাউল-কবি আবিষ্কৃত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মদন বাউল এক ক্ষণজন্মা কবি। "নিঠুর গরজি, তুই মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে" ও "হৃদয় কমল চল্‌তেছে ফুটে কত যুগ ধরি" শীর্ষক তাঁর দুইটী গান ভারতীয় দার্শনিক সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিভাষণে উদ্ধৃত করেছিলেন। সমস্ত বাংলা সাহিত্যে মদনের এই গান পরমাশ্চর্য্য সামগ্রী। যতদূর জানি, এর জন্য বাংলার রসিকসমাজ মরমী সাহিত্যের ভাণ্ডারী শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের কাছে ঋণী।

এই যে কয়েক শ্রেণীর সাহিত্যের উল্লেখ করা হলো, এ ভিন্ন নানা রকমের পল্লীগান মুসলমান চাষীর কণ্ঠে গীত হয়ে থাকে। সেই সব গানের রচয়িতার নাম প্রায়ই পাওয়া যায় না। তা না যাক, কবিতা বা গান যে রচনা করে শুধু তারই নয়, যে মনঃপ্রাণ দিয়ে পাঠ করে বা গায় তারও বটে। এই ভাবে কয়েক শতাব্দী ধরে বাংলার মুসলমান ভাব-চর্চ্চার আস্বাদ লাভ করে আস্‌ছে তার মাতৃভাষার সাহায্যেই।

কিন্তু এই সহজ ধারা একালে এমন বিকৃত হলো কেন? বিকৃত যে হয়েছে কেউই তা অস্বীকার করেন না। সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমান তো নানা ভাবেই দ্বিধান্বিত, এমন কি পল্লীর মুসলমান চাষীর সেই গানের সাধনার ধারাও অনেকখানি বদলে গেছে।

এ ব্যাপারটী বাস্তবিকই বড় জটিল। আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি তা নিবেদন করতে চেষ্টা করব।

বাংলার মুসলিম জীবনের এই বিপর্য্যয়ের প্রথম কারণ—রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন বাংলার মুসলমানের সাহিত্যিক জীবনে বিপর্য্যয় আন্‌ল তার সমাজ-গঠন ও চিত্তোৎকর্ষের দুর্ব্বলতার জন্যই। এই পরিবর্ত্তনে উত্তর ভারতের মুসলমানের জীবন এমন কৃষ্টি-ধারা-বিচ্যুত হয় নাই। বৌদ্ধ হিন্দু পাঠান আরব প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণে বাংলার মুসলমান-সমাজ গঠিত। এই বৈচিত্র্য বা বিচ্ছিন্নতা অখণ্ডত্বে রূপান্তরিত হবার সময় ও সুযোগ পায় নাই; মোগল-ভারতে আভিজাত্য-বোধের লালিত হবার অবকাশ কম ছিল না। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত "সিয়ার মোতাখেরীন"-এর ইংরাজি অনুবাদক তাঁর গ্রন্থে স্থানে স্থানে যে মন্তব্য করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যায়, বাংলা দেশে সাধারণ মুসলমান ও ভদ্র মুসলমানের ভিতরে (একালের মুসলমানের ভাষায় 'আশরাফ' ও 'আতরাফে'র ভিতরে) একটী সুবিস্তীর্ণ ব্যবধান ছিল। এই ভদ্র মুসলমানদের চিৎ-প্রকর্ষের ভাষা যে ফারসী ও উর্দ্দু ছিল এ সম্বন্ধে হাকিম হবিবুর রহমান ঢাকার "মুসলিম সাহিত্য-সমাজে"র পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে তাঁর অভিভাষণে অনেক যুক্তিপূর্ণ কথার অবতারণা করেছেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য এই যে উর্দ্দু সাহিত্যে বাংলার বিভিন্ন স্থানের মুসলমানের মূল্যবান দান আছে; সেটী নিশ্চয়ই দীর্ঘ সাধনার ফল। আর এরূপ ঘটনা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বাংলার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বহুকাল পর্য্যন্ত সংস্কৃতকে ব্যবহার করে আসছিলেন তাঁদের চিৎ-প্রকর্ষের ভাষারূপে। রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনে রাজাশ্রয়-হীন এই ভদ্র মুসলমান-দল অচিরেই শক্তিহীন হয়ে পড়লেন, আর দেশের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য তাঁদের প্রকর্ষ ধ্বংস হয়ে গেল। মুসলমান-সমাজের এক অংশে বিপর্য্যয় ঘটবার পরে অন্যান্য অংশ যে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে এ সম্ভবপর নয়।

এর উপর সমস্ত দেশের ভিতরে একটা বড় ব্যাপার ঘটল। বাংলা দেশই নূতন সভ্যতার নিকেতন হয়ে উঠ্‌ল। বাংলার হিন্দু-সমাজে এমন মনীষীর জন্ম হলো যাঁরা এই নূতন বিদ্যা ও প্রকর্ষ মনঃপ্রাণে গ্রহণ করবার পথ আবিষ্কার করলেন। এই নব-ঐশ্বর্য্য-লব্ধ হিন্দুর সঙ্গে তুলনায় মুসলমান হয়ে চললো দিন দিন অধিকতর শ্রীহীন।

দ্বিতীয় কারণ—ওহাবী প্রভাব। ওহাবী প্রচারকেরা বাংলায় এসেছিলেন অনেকখানি শান্ত মূর্ত্তি ধরে—ইসলামের শরীয়ত নূতন করে প্রচার করবার উদ্দেশ্যে। তাঁদের মতে, বাংলার অধিকাংশ মুসলমান ছিল অদ্ভুত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীব, তাঁরাই তাদের মুসলমানী আচার ব্যবহার নূতন করে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁদের দাবী মিথ্যা নয়। এক আচারের পরিবর্ত্তে অন্য আচার তাঁরা বাংলার মুসলমানকে শেখাতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু যেভাবে শিক্ষা দিলে কোরআনের ইস্‌লামের মর্য্যাদা রক্ষা হতো সেইভাবে দেওয়া হয়েছে কি না সেটাও বিচার্য্য। আমি কেবল একটি বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ওহাবী অথবা ওহাবী-প্রভাবান্বিত প্রচারকদের প্রচারের ফলে বাংলার মুসলমানের অনেকে নামাজ পড়তে শিখেছেন,—কিন্তু কিছুই না বুঝে। অথচ নামাজে যে-সব কথা ব্যবহার করা হয় তার অর্থ সম্বন্ধে অমনোযোগীর প্রতি কোরআনে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, আর বলা হয়েছে—নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র চক্ষে অধমতম জীব হচ্ছে বধির ও বোবা—যারা বোঝে না (৮ঃ২২)।

মোটের উপর ওহাবী-আন্দোলন ধ্বংসশীল মুসলিম জগতের, বিশেষ করে' মুসলিম ভারতের, এক সশস্ত্র প্রতিবাদ। কিন্তু সে-সংঘর্ষে তার ভাগ্যে জয়লাভ ঘটে নাই। তাই তার পক্ষভুক্তদের ভাগ্যেও লাভ হয়েছে পরাজিত পক্ষের মত নৈতিক ও আত্মিক দুর্গতি।

তৃতীয় কারণ—মনীষীর অভাব। মনীষীর জন্ম কেন কোনো কোনো সমাজের ভিতরে কখনো কখনো হয় তা বলা শক্ত। তবে তাঁদের আবির্ভাব না হলে কোনো জাতির বা দেশের জীবনে নূতন উদ্যম যেন অসম্ভব হয়েই থাকে। সমাজ যখন অপেক্ষাকৃত নিম্নতর অবস্থায় থাকে অথবা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয় তখন তার জন্য মনীষীর প্রয়োজন হয় সব চাইতে বেশী। কিন্তু বাংলার মুসলমানের প্রয়োজন যত বড়ই হোক তার সমাজে কোনো মনীষীর আবির্ভাব ঘটে নাই। উত্তর ভারতে স্যর সৈয়দ আহ্‌মদের আবির্ভাব সেখানকার মুসলমানদের জন্য কল্যাণপ্রসূ হয়েছিল। তাঁকে মনীষী বলা যায় কি না এ নিয়ে মতভেদ হতে পারে, কেননা মনীষী সাধারণতঃ তাঁকেই বলা হয় যাঁর কাছ থেকে তাঁর চারপাশের লোক জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটী নূতন অথচ চিরসত্য দৃষ্টি লাভ করে। তবে সবল-কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্ন এক শক্তিশালী কর্ম্মী তিনি ছিলেন নিশ্চয়ই, তাই সিপাহি-বিদ্রোহের ফলে পশ্চিমী মুসলমানের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার আশু প্রতি-কারের চেষ্টা তিনি নিপুণভাবেই করেছিলেন। বাংলার হিন্দু-সমাজে যে কয়েকজন মনীষীর জন্ম হয়েছে তাঁদের প্রভাব মুসলমানের উপর তেমন কিছুই হয় নাই, তার কারণ তাঁদের বিশেষ কর্ম্মক্ষেত্র ছিল হিন্দু-সমাজ, আর নানা প্রভাবের তাড়না ভোগের ফলে মুসলমানের এমন মনোভাবও ছিল না যে এই সব মনীষীর বাণীর ও কর্ম্মের পূর্ণ অর্থ তাঁদের হৃদয়ঙ্গম হবে।

একটি কথা হয়ত বলা যেতে পারে। বাউল গানকে আমি সেকালের সাহিত্য বলেছি, অথচ যে সব মুসলমান বাউলের নামোল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা সবাই ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক, হয়ত ওহাবী-প্রভাবের সমবয়সী অথবা পরবর্ত্তী। এর উত্তরে বলব, মুসলমান বাউল-

সাহিত্য একালে জন্মেছে বটে কিন্তু তার নাড়ীর যোগ রয়েছে সেকালের অর্থাৎ মধ্যযুগের মরমী সাধনার সঙ্গেই. একালের বহির্মুখী জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য তার কিছুমাত্র দরদ আছে তা বোঝা যায় না। মুসলমান-সমাজের লৌকিক ধর্ম্মের প্রতিবাদ এ-সাহিত্যে আছে বটে, কিন্তু সেই প্রতিবাদ এর ভিতরকার প্রধান কথা নয়, প্রধান কথা হলে বাউল-সাহিত্য একালের সাহিত্যই হোতো, এর প্রধান কথা হচ্ছে অন্তর্লোকের এক অপরূপ পরিচয় লাভ করা—যে-পরিচয় লাভের ফলে অনুভাবকের জীবন হয়ে ওঠে মধুময়, জগৎ হয় আনন্দ-নিকেতন।

বাংলার মুসলিম জীবনে ওহাবীপ্রভাব ও মনীষীর অভাব সম্বন্ধে বহুকথা বলবার আছে। কিন্তু আপাততঃ শুধু এই কথাটি বলতে চাই যে বাংলার মুসলমান এক সম্পূর্ণ নূতন পরিবেষ্টনে এখন উপস্থিত, সেই পরিবেষ্টনে আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের জন্য নূতন আয়োজন তার চাই-ই, কিন্তু সেই আয়োজনের উপকরণ সে যে তার চারিদিকে সন্দিগ্ধ ও অপ্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পাবে না পাবে শান্ত ও সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই, এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাটিও সে বুঝছে না এই ওহাবী-প্রভাব ও নব সৃষ্টিধর্ম্মী মনীষীর অভাবের জন্যই।

কিন্তু বাঙালী মুসলমানের একালের জীবনে এই সব বিপত্তির জন্য যে সে ক্রমাগত অধঃপাতের দিকেই যাচ্ছে তা সত্য নয়। তার কৃষ্টি-ধারার বিপর্য্যয়, আর্থিক অসচ্ছলতা, রাজনৈতিক দৃষ্টির অভাব, এসব বিড়ম্বনায় তার জীবন বিড়ম্বিত হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এত বিড়ম্বনা-ভোগের ভিতরে তার প্রাণপুরুষ যে মুহ্যমানই হয় নাই তার পরিচয় ফুটতে চেয়েছে তার একালের সাহিত্যে। মীর মোশার্‌রফ হোসেনের ও কায়কোবাদের সাহিত্য অলোকসামান্য কিছু নয় বটে, কিন্তু নৈরাশ্য ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ওহাবী পরিবেষ্টনে তাঁরা যে সহজভাবে জীবনকে গ্রহণ

করতে পেরেছিলেন, এর হর্ষ বেদনা ও প্রেমের মাধুর্য্য উপভোগ করতে পেরেছিলেন, জগতের অনাত্মীয় কখনো তাঁরা হন নাই—এরও মাহাত্ম্য তো কম নয়। সৈয়দ ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজীর ও শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের প্রথম-যৌবনের রচনাও এমনিভাবে হৃদয়গ্রাহী। আর এই সময়ের চিন্তাশীল লেখক হচ্ছেন পণ্ডিত রেয়াজউদ্দিন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুস্‌লিম জামালুদ্দিন-আল্‌-আফ্‌গানীর জীবন-কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর স্বসম্প্রদায়ের নবজীবনারম্ভের কথাও তিনি ভেবেছিলেন। আমাদের একালের সাংবাদিকদের উপরে তাঁর "প্যান ইসলাম"-বাদের ছায়া পড়েছে মনে হয়, কিন্তু তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রীতির উত্তরাধিকারী হবার প্রয়োজন তাঁরা তেমন অনুভব করেন নাই।

কিন্তু এযুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে চিন্তার ক্ষেত্রে বিশেষ গৌরবের আসন এই তিন জনের—মিসেস আর এস্‌ হোসেন, কাজি ইমদাদুল হক, ও লুৎফর রহমান। একালের মুসলমানকে কঠিন কটু কিন্তু জীবনপ্রদ অনেক কথা তাঁরা শুনিয়েছেন। সেসব কথা তাঁদের কানে তেমন যে প্রবেশ করেছে তা মনে হয় না। তবে ব্যর্থ যে হয়েছে তাও নয়। আর সাহিত্যের প্রভাব হয়ত এমনিভাবেই হয়।

মিসেস আর এস্‌ হোসেনের প্রতিভা একালের ভগ্নহৃদয় মুসলমানের জন্য যেন এক দৈব আশ্বাস। নিবাত নিষ্কম্প মুসলমান-অন্তঃপুরে যদি এহেন বুদ্ধির দীপ্তি, মার্জ্জিত রুচি, আত্মনির্ভরতা, ও লিপিকুশলতার জন্ম হয় তবে আজো ভয় কেন বাংলার মুসলমানের ঘোচে না! তবে আজো কেন নিজেকে পরিবেষ্টনের সন্তান ও জগতের অধিবাসী বলে পরিচিত করবার সাহস তার হয় না! আর লুৎফর রহমান সম্পর্কে এই একটী কথা না বলে অন্যায় হবে যে একালের বাংলার মুসলমান-সমাজে ধর্ম্ম নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা ও মাতামাতি কম হয় নাই, কিন্তু সেই

বিপুল আড়ম্বরের ফাঁকি একদিন যখন নিঃশেষে ধরা পড়বে তখন এ-যুগ ধর্ম্মহীনতার, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের জন্য বেদনাহীনতার, অভিযোগ থেকে অব্যাহতি লাভ করবে যাঁদের অতন্দ্রিতচিত্ততার দৃষ্টান্তে, এই কিছু-অব্যবস্থিত প্রতিভা লুৎফর রহমান তাঁদের মধ্যে এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

একালের বাঙালী মুসলমানের সৃষ্ট এই সাহিত্য দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের দৃষ্টি তেমন আকর্ষণ করতে পারে নাই, তার কারণ মনে হয় এর অপ্রাচুর্য্য ও অনবদ্যতার অভাব। কিন্তু যাঁদের জন্য এই সাহিত্য বিশেষভাবে রচিত হয়েছিল তাঁরা যে এর পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে পারেন নাই এইটি-ই এর গৌরবহীনতার প্রধান কারণ বলে মনে হয়।

তবে এঁদের চাইতে ভাগ্যবান সাহিত্যিকও এযুগে মুসলমান-সমাজে জন্মেছেন—বৃহত্তর দেশে তাঁরা সমাদর লাভ করতে পেরেছেন। আমি নজরুল ইসলাম ও জসীমউদ্দিনের কথা বলছি। মুসলমান-সমাজের এই দুই তরুণ শিল্পীর সম্বন্ধে মত প্রকাশ করবার সময় এখনো বহু দূরে থাকুক, কিন্তু এঁরা ধন্য হয়েছেন এই জন্য যে একালের মুসলমান-সমাজের অন্তরে তার সাহিত্যিক সার্থকতা সম্বন্ধে এক নব আশার সঞ্চার এঁরাই করতে পেরেছেন।

কিন্তু তবু বলতে হবে, বাংলার মুসলমান-সমাজে সাহিত্য-চর্চ্চার যে অবস্থা, অর্থাৎ লেখক ও পাঠকের যে সম্বন্ধ, তা শুধু অসন্তোষজনক নয়, অনেকখানি আপত্তিকর। পাঠক-সমাজের বিচার শক্তি এখনো অত্যন্ত দুর্ব্বল, সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ পুরোপুরি নেবার উদ্দেশ্যে আমাদের অনেক লেখককে অনেক সময়ে দেখতে পাওয়া যায় অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর রচনায় হাত দিতে। পাঠক-সমাজের অজ্ঞতা এইভাবে দাঁড়াচ্ছে লেখক-সমাজের উৎকর্ষলাভের পরিপন্থী হয়ে। এর আর

এক ফলও ফলেছে। সেইটী বেশী মারাত্মক। এমন পাঠককে অবহেলা করবার প্রবৃত্তি একটুখানি তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাহিত্যিকের মনে সহজেই আসে। ফলে সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন চরমপন্থী চিন্তাশীল ও পরিবর্ত্তন-ভীত পাঠক-সমাজ এই দুয়ের প্রাদুর্ভাব এই সমাজে হচ্ছে। এই বিরোধের পরিণতি কোথায় জানি না, কিন্তু মুসলিম-সভ্যতার এক গৌরব-যুগে এমনি ধরণের বিরোধ সমাজে জেগেছিল, আর তার ফল সমগ্র মুসলমান-সভ্যতার জন্য অবাঞ্ছিতই হয়েছিল, এ কথাটি সহজেই মনে পড়ে।

তবে এ বিরোধ দীর্ঘকালস্থায়ী নাও হতে পারে। কিন্তু সেজন্য চেষ্টাও যেন কম না হয়। দেশের সর্ব্বত্র শিক্ষাবিস্তারের প্রেরণাদান, উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র পরিচালনা, এসব সাহিত্যিকদের দ্বারা সম্ভবপর হতে পারে, কিন্তু তারও চাইতে বড় কথা এই যে উদ্দেশ্য-আদর্শের যে-বিরোধ একালে মুসলমান-সমাজে প্রবল হতে চাচ্ছে তার একটা যোগ্য মীমাংসার চেষ্টায় যদি সমাজের সব শ্রেণীর চিন্তাশীল অগ্রসর হন তবে কোনো মীমাংসায় উপনীত হতে না পারলেও সমস্ত সমাজের মানস-উৎকর্ষের এক অভিনব ভিত্তিপত্তন তাঁরা করতে পারবেন। অবশ্য তার জন্য প্রথম প্রয়োজন এই যে, সব শ্রেণীর চিন্তাশীলই হবেন সত্য ও কল্যাণকামী।

মনে হয় এমন এক মানস-উৎকর্ষের পথে বাংলার মুসলমান-সমাজ আস্তে আস্তে পা বাড়াতে শুরু করেছে। এ সমাজে যাঁরা নিজেদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মনে করেন সমাজের উপরে তাঁদের প্রভাব এখনো নগণ্য, কিন্তু এই দলের ভিতর থেকেই 'বুদ্ধির মুক্তি'-বাদীদের উদ্ভব হয়েছে, আর তাঁদের জিজ্ঞাসা যে সমাজে কিছু সাড়া জাগাতে পেরেছে তা অস্বীকার করা যায় না। আর আলেম-সম্প্রদায়ের

ভিতরেও এমন চিন্তাশীলের আবির্ভাব হচ্ছে যাঁরা অলৌকিকতা দুর্জ্ঞেয়তা ইত্যাদি থেকে ধর্ম্মকে মুক্ত করে তাকে করতে চাচ্ছেন প্রধানতঃ সহজ বুদ্ধির বিষয়। এই সম্পর্কে বাঙালী আলেম মওলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী ও মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর নাম উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু এই শ্রেণীর চিন্তাশীল আলেমদের মুকুট-মণি হচ্ছেন উর্দ্দুভাষী বাঙালী আলেম মওলানা আবুল কালাম আজাদ। তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত "তরজমান-ই-কোরআন"-এর ভূমিকায় তিনি ইসলামের যে উদার ও সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন তাতে দেশের আলোকপন্থীদের শ্রদ্ধাভাজন তিনি হয়েছেন। তাঁর ব্যাখ্যায় মুসলমান-সমাজ ওহাবীপ্রভাবের কাণ্ডজ্ঞানবিমুখতা ও অপ্রেম থেকে মুক্তি পাবে আশা করা যায়।

বাংলার মুসলমানের দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনের সঙ্গে যে-পরিচয়টুকু আমাদের হলো তা থেকে এ কথাটি পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে সেকালের বাঙালী মুসলমান সহজ ভাবেই মাতৃভাষায় সাহিত্যের চর্চ্চা করেছিলেন, আর একালে সে সহজ ধারা কিছুদিনের জন্য বিপর্য্যস্ত হলেও আবার তাতে প্রতিষ্ঠিত হবার পথেই তাঁরা চলেছেন। শুধু তাই নয়, পরিবেষ্টনের সঙ্গে প্রেমের যোগ ও অকুণ্ঠিত সত্যানুসন্ধান এ না হলে যে জীবনে শ্রেয়োলাভ হয় না এ-সত্যের প্রমাণও রয়েছে মুসলমানের সেকালের ও একালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সাধনায়। তবে সাদৃশ এমনি ধরণের থাকলেও দুয়ের ভিতরে পার্থক্যও আছে। মধ্য-যুগের অন্যান্য চিন্তাশীলের মতো সেকালের মুসলমানও প্রধানতঃ ছিলেন গুরুবাদী ও জীবনের অনিত্যতাবাদী, কিন্তু একালের মুসলমান মুগ্ধ হতে চাচ্ছেন বৈজ্ঞানিকতায় ও জীবনের ঐতিহাসিক বিকাশের দীপ্তিতে।

আরো একটা ব্যাপার চোখে পড়ছে—বঙ্গ-সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধারা সম্মিলিত হয়েই বয়েছে, কিন্তু গঙ্গা-যমুনা-ধারার মতো। ভবিষ্যতেও দু'য়ের এই অদ্ভুত স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে কি না সেটা হয়ত নির্ভর করবে তাদের পরস্পরের ভবিষ্যৎ সামাজিক সম্বন্ধের উপরে। তবে একালের বাংলা সাহিত্যে এমন একটা চিন্তা-ধারা রূপ লাভ করতে চাচ্ছে যার পরিপূর্ণ বিকাশে মুসলমানসমাজ-উদ্ভূত সাহিত্যিক বিশেষ সাহায্য করতে পারবেন বলে মনে হয়।

কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলতে চেষ্টা করা যাক। হিন্দু-সাধনার শ্রেষ্ঠ কথা হয়ত নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা। জিজ্ঞাসার এক সুগভীর তৃপ্তি সেই চিন্তাধারায় আছে; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভাল কোনো কিছুতেই নাই, তাই নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনার সঙ্গে যুক্ত দেখতে পাওয়া যায় উৎকট ব্যক্তিত্ববাদ ও কর্ম্মে অবিশ্বাস। বাংলার একালের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অংশে রূপ ধরে উঠতে চাচ্ছে বীর্য্যবন্ত জাগতিক জীবনের আদর্শ—বিশ্ব-জ্ঞান ও বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের দিকে যার গতি। কিন্তু যে-সমাজের ভিতরে এর উদ্ভব হয়েছে তার সেই নির্গুণব্রহ্ম-বাদ ও জাতি-অভিমান এর সার্থকতা লাভের অন্তরায় সহজেই হতে পারে। এই অবস্থায় মুসলমান-সমাজের সাহিত্যিকদের দ্বারা এই ভাবধারার বিশেষ সার্থকতা সাধনের কথা মনে হয় এই জন্য যে, মুসলমানের এতদিনের ধর্ম্মাদর্শে যে আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা আছে তিনি নানা সদ্‌গুণের আধার, সেই সদ্‌গুণময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে' দৈনন্দিন জীবন সুন্দর-ভাবে যাপন করবার এই যে মুসলমানের প্রাচীন শিক্ষা, তার একালের জীবনের বিশেষ প্রয়োজনে সেই শিক্ষার সাহায্য তার লাভ হবে এ আশা করা যেতে পারে।—তবে এসব হচ্ছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা। সেই ভবিষ্যৎকে কতকটা সুনিশ্চিত করা যেতে যে না পারে

তা নয়। কিন্তু সে-ক্ষমতা শুধু তাঁদেরই আছে যাঁদের বর্ত্তমান কর্ম্মধারা সুনিশ্চিত।

বাংলার 'মুসলিম সাহিত্যে'র বিশেষ পরিবেষ্টন সম্বন্ধেই এতক্ষণ কয়েকটী কথা বলতে চেষ্টা করেছি। এইবার সাধারণভাবে সাহিত্যের আকৃতি-প্রকৃতি উদ্দেশ্য-আদর্শ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা শুরু করে আপনাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা করব না নিশ্চয়ই। তবে সাহিত্যিকদের সভায় এই-সব বিষয় সম্পর্কে দুই একটী কথা না বললে বক্তব্য নিতান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে মনে হয়। আমি সাহিত্যে রস ও সমস্যা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি একথাটীর সঙ্গে আমরা সবাই অত্যন্ত পরিচিত। কিন্তু এর প্রতিবাদ বা সমর্থন কিছুই না করে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি অন্য একটি কথার দিকে—সাহিত্যের উদ্দেশ্য জীবনের সমস্যার সমাধানের প্রয়াস। এই প্রয়াস জ্ঞাতসারেও হতে পারে অজ্ঞাতসারেও হতে পারে। কিন্তু সমস্যার সোনার কাঠির স্পর্শ না পেলে সাহিত্যিক-চিত্তের নিদ্রাভঙ্গ হয় না, সাহিত্য সক্রিয় হয় না, এ এত সত্য কথা যে এর প্রমাণ দেবার দরকার করে না। রস অনেক সময়ে এই সমস্যার আনুষঙ্গিক, যেমন ফুলের রং ও পাপড়ির বিন্যাস তার বীজকোষের আনুষঙ্গিক। এই সমস্যার দিকে দৃষ্টি রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করলে সাহিত্য সাংবাদিকতায়ও পর্য্যবসিত হতে পারে, তবু তা হবে অর্থপূর্ণ—সুপাঠ্য, কিন্তু শুধু রস বা সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করলে তা যে কি বিষম পাগলামির ব্যাপার হয়, বিশেষ করে এই স্বল্প-অবসরের যুগে, বাংলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রস-স্রষ্টাদের রচনায় রয়েছে তার দৃষ্টান্ত। যীশুখৃষ্ট বলেছেন, Take not the name of God in vain, সাহিত্যে

রস ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে,—ও এমনি দুর্ল্লভ ব্যাপার যে ও-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে নিপুণভাবে জীবনের সমস্যার আলোচনা ভিন্ন কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর কিছু যে করতে পারেন তা মনে হয় না।

এই সমস্যা-সাহিত্যের কথা আপনাদের কাছে উত্থাপন করছি কতকগুলো কথা ভেবে। বাংলার মুসলমান এক নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব করতে শুরু করেছে। সেই নূতন জীবনের সূচনায় নানা সমস্যা সহজেই তাকে আঘাত দিচ্ছে। সেই সব সমস্যা যদি গানে, কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, রূপকে, কিম্বা নিবন্ধে, সে রূপ দিতে চেষ্টা করে তবে বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সম্পদ সে দান করতে পারবে আশা করা যায়। অনেক সময়ে দেখা যায়, বড় বড় উত্তেজনার মুখে উৎক্ষিপ্ত হয় বড় বড় সাহিত্য।

আমাদের দীর্ঘদিনের অজ্ঞানতার ও অপ্রেমের বেদনা সাহিত্যে সার্থকতা লাভ করুক, এই প্রার্থনা করি।

২৬ ডিসেম্বর, ১৯৩২

# 'রবীন্দ্রকাব্যপাঠে'র ভূমিকা

[ এটি লেখা হয় ১৯২৬ সালে। তখন রবীন্দ্রনাথ ঢাকায়। এখানে যে-কথাটি বলতে চেষ্টা করা হয়েছে তা আরো বিস্তৃতভাবে বলা দরকার, এই ধারণা থেকে এটি রবীন্দ্রকাব্যপাঠ গ্রন্থখানির অঙ্গীভূত হয় নাই। ]

প্রচলিত কথায় যাকে সমালোচনা বলা হয়, রবীন্দ্রকাব্যপাঠ তা নয়—পড়লেই তা বুঝতে পারা যাবে। এ রবীন্দ্র-প্রতিভার একটু-খানি তারীফ। তাঁর চিন্তার ও সৃষ্টির সমালোচনা করবার, অন্যান্য চিন্তা ও সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করে' তার "যথার্থ মূল্য" নির্দ্ধারণ করবার, সময় উপস্থিত হয় নাই। তার একটি কারণ, রবীন্দ্র-প্রতিভা এখনো সৃষ্টিশীল। কিন্তু তার চাইতেও বড় কারণ এই যে, এই প্রতিভাকে আমাদের আজো প্রাণ ভরে' অনুভব করা হয় নাই। কি বিপুল অনুভূতি ও মনীষা এর ভিতরে রয়েছে তা অনুভব করে' কিছু আপনার করে না নিতে পারলে অন্যান্য সাহিত্য-মহারথদের তুলনায় বা অন্যান্য সৃষ্টির গঠন বা সৌষ্ঠবের সঙ্গে তুলনায় এর যাথার্থ্য নিরূপণ করতে যাওয়া কতকটা অর্থহীন। সত্যকে, সৌন্দর্য্যকে, নিজে উপলব্ধি করে' পুনঃ-সৃষ্টির চেষ্টা না করে' শুধু অতীতের সৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করে' তার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা করা "পরের মুখে ঝাল খাওয়া"র চাইতে বড় কাজ নয়। সাধনার মর্ম্মের মতো সাধনার দেহও যুগে যুগে বিভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। রবীন্দ্র-সাধনার মর্ম্ম বাঙালীর মর্ম্মকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্পর্শ করেছে, সেই স্পর্শনের ফলে বাঙালীর সমসাময়িক কাব্যে শুধু আকুলি-বিকুলিই জেগেছে। প্রথম অনুভূতির অস্বচ্ছন্দতা গভীর অনুভূতিতে রূপান্তরিত হলে যে সত্যকার

সৃষ্টি হবে তারই সঙ্গে তুলনায় এই প্রতিভার সত্যকার মূল্য নির্দ্ধারণ হবে—যেমন প্রাচীন কবিদের সৃষ্টির মূল্য-নির্দ্ধারণ পরে-পরের সৃষ্টির সঙ্গে তুলিত হয়ে হয়েছে, বর্ত্তমানের ভিতর দিয়ে ভবিষ্যতেও তা চলবে। বাস্তবিক কোনো বড় সাধনার যথার্থ মূল্যের নির্দ্ধারণ ভবিষ্যতের নব নব সৃষ্টির ভিতর দিয়েই কিছু কিছু হয়। বড় সাধনা জড় জগতের গ্রহ-নক্ষত্রের মতো এক পরমরহস্যময় বিরাট সত্য, ভাবের জগতে এমনি করেই তা বিদ্যমান থেকে নব নব কার্য্য-কারণের উৎস হয়।

কবি-প্রতিভা বল্‌লে বিশেষ এক শ্রেণীর শিল্প-প্রতিভাই সাধারণতঃ বোঝায়। কবি এক আশ্চর্য্য ক্ষমতায় কতকগুলো মানস-মূর্ত্তি ফুটিয়ে তোলেন; তাঁর নিজের জীবনের সমস্ত দুঃখ চাঞ্চল্য বিক্ষোভ সাধারণতঃ অন্তরালে রেখে এমন অনবদ্য সৃষ্টি মানুষের সামনে দাঁড় করান যার রহস্যময় সৌন্দর্য্য চিরদিন মানুষের সামনে যেন অপূর্ব্বই থেকে যায়। বলা যেতে পারে, এ এক ধরণের সেবা, সেবক আত্মগোপন করে' তাঁর রূপ-রসের সেবা মানুষের দরবারে হাজির করে দেন। এর দৃষ্টান্ত ব্যাসের মহাভারত, হোমরের ইলিয়াড্, কালিদাসের শকুন্তলা, শেক্‌স্‌পীয়রের ম্যাকবেথ ইত্যাদি। যাঁরা এ-সমস্তের স্রষ্টা তাঁদের কথা বিস্মৃত হয়ে এই সমস্ত সৌন্দর্য্যের কক্ষে কক্ষে শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিচরণ করতে পারা যায়। যেমন—মহাভারতের ভীষ্ম-পরশুরামের গুরু-শিষ্যের যুদ্ধ, উত্তর-গোগৃহ-রণের প্রারম্ভে বাণ দিয়ে অর্জ্জুনের গুরুপদ-বন্দনা, দাম্ভিক চিরশত্রু দুর্য্যোধনকে চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য যুধিষ্ঠিরের অর্জ্জুনকে উপদেশ দান, ভক্ত ভীষ্মের তাঁর ভক্তি-ভাজন শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্রধারণে বাধ্য করা, তাঁর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা, আর শেষে এই ধ্বস্তাধ্বস্তিলব্ধ রাজ্য পরিত্যাগ করে' বিজয়ী পাণ্ডবদের মহা-প্রস্থান; অথবা, তপোবনে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার

পরস্পরকে প্রথম সন্দর্শন, পতিগৃহগামিনী শকুন্তলার সহকার-তরুকে আলিঙ্গন দান, মৃগশিশুকে সান্ত্বনা দান; অথবা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে লেডি ম্যাকবেথের চলা ও বলা—

Hell is murky !
……all the pefumes of Arabia will not sweeten
this little hand…….

এসব যেন যমুনাতীরের সেই চিরশুভ্র, একবিন্দু অশ্রুর মতো উজ্জ্বল, তাজমহল! কত কবি কত প্রেমিক কত ভাবুক তার কত বর্ণনাই না দিলে, কিন্তু আজো রহস্যের পূর্ণ-উদ্ঘাটন সম্ভবপর হলো না।……

স্রষ্টার নিজেকে আড়ালে রেখে এই যে সৃষ্টি-ভঙ্গিমা, মানস-জগতে এই-ই একমাত্র সৃষ্টি নয়। আর এক সৃষ্টিপদ্ধতি আছে, বিশেষভাবে সে নিজেকে সৃষ্টি করা,—মহাপুরুষ যেমন স্বীয় চরিত্রের ভিতর দিয়ে নিজেকে সৃষ্টি করেন, গীতি-কবি যেমন তাঁর অপরূপ সুখ-বেদনার ভিতর দিয়ে নিজেকে বিকশিত করে তোলেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার সৃষ্টি এই শেষোক্ত ধরণের সৃষ্টি। সে-প্রতিভা "আমি"র অনন্ত সুখ-দুঃখ অনন্ত রূপ পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে প্রকাশ করে এসেছে। সে-প্রকাশ যে সব সময়ে অনবদ্য হয়েছে, তা নয়। কিন্তু এ-প্রতিভা ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে এসেছে এবং কি আশ্চর্য্য এর ক্ষমতা, বজ্রসূচির মতো এ ভাবের সমস্ত মণি বিদ্ধ করে' গলায় পরে চলেছে। তাই এই প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছি—তীব্র অনুভূতি আর সন্ধানপরতা। রূপসৃষ্টি এর প্রকৃতিগত, এর অনুভূতি আপনা থেকে কেমন-এক রূপে হিল্লোলিত হয়ে ওঠে, কিন্তু তারও ভিতরে তীব্র অনুভূতি আর সন্ধানপরতাই প্রধান বলে প্রতিভাত হয়। রবীন্দ্র-প্রতিভাকে শ্রদ্ধেয় শশাঙ্কমোহন সেন বলেছেন, "দার্শনিক প্রতিভা"। কিন্তু "দার্শনিক প্রতিভা" এ নয়

এই জন্য যে যুক্তি বা বুদ্ধি এর ভিতরে প্রধান নয়, যদিও খুব প্রবল। অনুভূতি তারও চাইতে এর বড় সম্বল।

রবীন্দ্রনাথের এই তীব্র অনুভূতির ক্রমাগত পরিবর্ত্তন আর সঙ্গে সঙ্গে রূপে হিল্লোলিত হয়ে ওঠা, এই দিক দিয়ে তাঁকে কবিগুরু বলা যেতে পারে। ইয়োরোপে এমনি প্রতিভা গ্যেটে। এই দুই মহা-প্রতিভাই প্রচলিত মত-বিশ্বাস অনুসারে বড় স্রষ্টা নন, যেমন বড় স্রষ্টা ব্যাস হোমর বা শেকস্‌পীয়র। কিন্তু মানস-সৃষ্টির অন্য অর্থে এঁরা মহা-স্রষ্টা; এঁরা রূপ দিয়েছেন নিজেদের অন্তরের গূঢ় অনুভূতিতে বিশ্বজনের অন্তরের অনুভূতি। মানুষের যে অনুভূতি একটু ভাবলে বুঝতে পারা যায় তা কত সূক্ষ্ম কত রকমারি। (পারশ্য-সাহিত্যে আত্তার, হাফিজ, রুমী, প্রভৃতির ভিতরে এমন আত্ম-সৃষ্টির বেদনা উপলব্ধি করা যায়। তাই হাফিজের দুই একটি চরণ জায়গায় জায়গায় তুলেছি)। — রবীন্দ্রকাব্যের দিকে যখন আমরা দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখতে পাই মানস-জগতের বিচিত্র অনুভূতি কি অদ্ভুতভাবেই তাঁর লেখনী-মুখে আত্মপ্রকাশ করেছে। অনেক জায়গাতেই তিনি যেন জাগ্রতভাবে কথা বলছেন না, কথা আপনি যেন তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে আস্‌ছে এবং নূতন নূতন অর্থে প্রকাশ পাচ্ছে।

প্রথম বয়স থেকে 'চৈতালি' পর্য্যন্ত কাব্য লিখে যদি রবীন্দ্রনাথের লেখনী স্তব্ধ হয়ে যেত তবে বলা যেত, তিনি কবি, কিন্তু খুব বড় স্রষ্টা নন—যেমন বড় স্রষ্টা ব্যাস হোমর বা কালিদাস। তার পরে তাঁর ভিতরে যে পরিবর্ত্তন এসেছে, তাঁর জীবন যে নূতন খাতে প্রবাহিত হয়েছে, তা থেকে তাঁর কাব্য-কীর্ত্তির অন্য অর্থ দাঁড়িয়েছে।

পরে-পরের সৃষ্টি সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে, খুব বড় শিল্পী তিনি নন, অনবদ্য রূপ ফলানোর চেষ্টা তাঁর ভিতরে বেশী নয়। কিন্তু তাঁর

প্রতিভা শুধু কবি-প্রতিভা নয়, এ বিশেষভাবে একটি আধ্যাত্মিক প্রতিভা। অথবা তাঁর প্রতিভা কবি-প্রতিভাই বটে, তবে সে-প্রতিভার প্রকাশ রূপের চাইতে মানস-গতিতেই বেশী। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র-কাব্য পাঠ না করলে তাঁর প্রকৃত মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যায় না। সব কবি সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা খাটে না।

রবীন্দ্র-প্রতিভা সেই যে প্রথম যৌবনে জাগ্রত হয়েছে তার পর আজ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ শতাব্দীর দীর্ঘ দিন ও দীর্ঘ রাত্রির ভিতরে এ যেন তন্দ্রাচ্ছন্নও হয় নাই। জগতের অথবা জীবনের অনির্ব্বাণ রহস্য তাঁর অনির্ব্বাণ সন্ধানী চিত্তে নব নব প্রেরণার সৃষ্টি করে চলেছে। এই যে সদা-জাগ্রত ভাব, শুধু জ্ঞানে নয় অনুভূতিতেও, এই সদা-জাগ্রততার জন্যই তাঁর সমগ্র রচনা একখানি গ্রন্থ হিসাবে পাঠ করা দরকার, এবং সেই ভাবে পাঠ করলেই এই প্রতিভার ভিতরে রয়েছে কি বল কি স্বাস্থ্য তা উপলব্ধি করা যাবে; এবং তারই ফলে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে এ’-কে আত্মসাৎ অথবা প্রয়োজন মতো অতিক্রম করে’ নবতর সৃষ্টি সম্ভবপর হবে। বড় সৃষ্টির ভিতরে যে পূর্ণ তপস্যার এবং সেবায় আত্ম-সমর্পণের ভাব রয়েছে সমগ্রতার দিক দিয়ে দেখলে রবীন্দ্র-কাব্যে সে-টি পাওয়া যাবে। এভাবে দেখলে রবীন্দ্র-কাব্য এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ বটে, তবে তা সুখপাঠ্য এই জন্য ভীতিকর নয়।

ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬

# গ্যেটে

সুবিখ্যাত দার্শনিক ক্রোচে গ্যেটে সম্বন্ধে যে বইটি লিখেছেন তাতে গ্যেটের মনীষা ও কাব্য সম্বন্ধে নানা বিচার বিশ্লেষণের পর বলেছেন—সাহিত্যের ইতিহাসের ক্রমবর্দ্ধনের ধারায় গ্যেটের স্থান কি তা নির্দ্দেশ করতে তিনি অক্ষম। বলা বাহুল্য, এ অক্ষমতার অন্য নাম আপত্তি, কারণ, তাঁর মতে—প্রত্যেক কবি হচ্ছেন এক একজন স্বতন্ত্র স্রষ্টা, আর তাঁর সৃষ্টির বিষয় হচ্ছে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব, তাঁর জীবনের সঙ্গে যার অবসান ; পরে পরে যাঁরা আসেন তাঁরা যদি সত্যকার কবি হন তবে নূতন-কিছু সৃষ্টি করেন, আর তা না হলে অনুকরণ করেন, কিন্তু অনুকারকের স্থান কাব্যের ইতিহাসে সত্যই নাই।—তবু তিনি স্বীকার করেছেন—"...in Goethe's poetry, in his rich, varied, impressionable and highly intelligent mind were mirrored for the first time in conspicuous fashion many sides of the modern spirit."

অনেক সাহিত্যিকই গ্যেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ; কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সব চাইতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বোধ হয় কার্লাইলের। তিনি তাঁর Hero and Hero worship গ্রন্থে Hero as man of letters অধ্যায় গ্যেটের কথা দিয়ে শুরু করেছেন, এবং গ্যেটের প্রতিভা যে জগতে এক নূতন বিস্ময়ের সামগ্রী, যে-হজরত মোহম্মদের তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন তাঁর প্রতিভার চাইতেও যে গ্যেটের প্রতিভা উচ্চতর গ্রামের, ইত্যাদি কথা বলবার পর

বলেছেন—গ্যেটের কথা থাকুক, কেউ আপাততঃ তাঁকে বুঝবে না। এই বলে তিনি রুসো বার্ণস্ প্রমুখ সাহিত্যিকদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে মনোনিবেশ করেছেন।—কিন্তু ক্রোচে যে গ্যেটের প্রতিভাকে modern spirit-এর ( আধুনিকতার ) এক বড় প্রতীক বলেছেন সেইটি ভাল করে বুঝতে পারলে গ্যেটের সঙ্গে আমাদের সত্যকার পরিচয় হয়ত খানিকটা হবে।

গ্যেটের ভিতরে এই যে সুবৃহৎ নূতন মন, বলা যেতে পারে, Renaissance ( নবজাগরণ )-সূচিত মানসিকতার তা এক বড় পরিণতি। শিক্ষিত ব্যক্তিরা জানেন, ইয়োরোপের Renaissance কয়েক শতাব্দীব্যাপী ব্যাপার, বহু লক্ষণের দ্বারা জটিল, আর তা শুধু সৌন্দর্য্য ও আনন্দের কাহিনীই নয়, সেই সৌন্দর্য্য ও আনন্দের সঙ্গে মিশে রয়েছে অনেকখানি কদর্য্যতাও—টলষ্টয় তাঁর শেষ বয়সের কতকগুলো রচনায় যার দিকে তাঁর বলিষ্ঠ অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেছেন। তবু এ সত্য যে Renaissance-কাহিনী মোটের উপর মানুষের ঊষর চিত্তক্ষেত্র পল্লবিত করবার কাহিনী, মানুষের জাগতিক জীবনের সুখ-সম্ভোগের এক করুণ মধুর কাহিনী।—কিন্তু এই Renaissance-পুষ্পের সৌরভে ফ্রান্স ইতালি ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ আমোদিত হলেও তুহিনাবৃত জার্ম্মেনী বহু দিন পর্য্যন্ত তা থেকে বঞ্চিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে সেখানে দেখা দিল ধর্ম্মান্দোলন Reformation, আপাতদৃষ্টিতে যা বহুদিক দিয়ে Renaissance-এর বিপরীত-ধর্ম্মী। অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্ম্মেনীর যে Classicism —প্রাচীন গ্রীক শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভের চেষ্টা—তার সঙ্গেই বরং Renaissance-এর আত্মীয়তা বেশী। কিন্তু জার্ম্মেনীর Classicism তার পূর্ব্ববর্ত্তী Reformation-এর

বিপরীতধর্ম্মী বোধ হলেও বাস্তবিকপক্ষে এটি Renaissance ও Reformation-এর বেশ এক সমন্বয়। এই Classicism-এর প্রবর্ত্তকদের সৌন্দর্য্যানুরাগ Renaissance-এর, কিন্তু তাঁদের সত্য ও স্বদেশানুরাগ, অন্য কথায়, কল্যাণানুরাগ, Reformation-এর। এই Classicism-এর এক শ্রেষ্ঠ নায়ক Lessing-এর একটি উক্তি খুব প্রণিধানযোগ্য। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বোঝাবার জন্য তিনি লিখেছিলেন Laokoon,—এক জগদ্‌বিখ্যাত বই, যদিও আকারে ক্ষুদ্র ; তিনিই বলেছেন—ঈশ্বর যদি এক হাতে পূর্ণজ্ঞান অপর হাতে প্রয়াসের অনন্ত দুঃখ এই দুটি নিয়ে বলেন, কোন্‌টা নেবে বলো. তা হলে বল্‌ব, পিতঃ, প্রমাদহীন পূর্ণজ্ঞান তোমাতেই সাজে, আমাকে দান কর অনন্ত প্রয়াস। *

জার্ম্মেনীর এই অষ্টাবিংশ শতাব্দীর Classicism-এর শ্রেষ্ঠ প্রতীক গ্যেটে। সত্য বটে তিনি নিজেকে খ্রীষ্টান বলে পরিচিত করবার জন্য ব্যগ্রতা দেখান নাই, বরং বলেছেন "আমি পেগ্যান" (Pagan), প্রকৃতির পূজারি, ( মুসলমানী ভাষায় "কাফের'), সেই পরমসৌন্দর্য্যপ্রেমিক গ্যেটের ভিতরেও সত্যান্বেষণের বীরব্রত কতখানি ছিল তা তাঁর এই উক্তি থেকেই বোঝা যাবে—"In religious scientific and political matters, I generally

*"If God were to hold in his right hand all truth, and in his left hand the single ever-active impulse to seek after Truth, even though with the condition that I must eternally remain in error, and say to me, "Choose", I would with humility fall before his left hand and say, "Father, Give! For pure thoughts belong to thee alone."

brought troubles upon myself because I was no Hypocrite and had the courage to express what I felt."

একটা জাতির জাগরণের ইতিহাসে প্রতিবিম্বিত যেন বসন্ত ও বর্ষার নৈসর্গিক প্রাচুর্য্য। বসন্তের আগমনে দেখা দেয় গাছে গাছে নূতন পাতা, ডালে ডালে লাখো পাখীর আনন্দ-গান; বর্ষায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে নদী নালা ভরে ওঠে উপরের নিরন্তর বর্ষণে;—একটা জাতির জাগরণ-সময়ে তেম্‌নি একই সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু কর্ম্মীর আবির্ভাব ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্ম্মান-জাগরণে দেখ্‌তে পাই—চিত্রের ক্ষেত্রে Oeser, Winckelmann; সাহিত্যে Klopstock, Herder, Wieland, Goethe, Schiller; দর্শনে Kant, Schelling, Hegel, Schopenhauer; সমালোচনায় Schlegel, সঙ্গীতে Mozart, Beethoven.........ইত্যাদি—এ যেন দেখ্‌তে দেখতে গগন বিদীর্ণ করে দাঁড়ালো বিচিত্রশীর্ষ এক বিরাট পর্ব্বত! বিশেষজ্ঞেরা বলেন—এই শৃঙ্গমালার উচ্চতম মহত্তমটির নাম গ্যেটে।

গ্যেটের চরিতাখ্যায়ক Lewes বলেছেন—"of all the failings usually attributed to literary men Goethe had the least of what could be called jealousy; of all the qualities which sit gracefully on greatness he had the most of magnanimity. এ আদৌ অতিরঞ্জন নয়। এই অসাধারণ প্রতিভা গ্যেটে তাঁর প্রতিভার ভারে আদৌ টলটলায়মান হন নাই। কত সহজভাবে তিনি বলেছেন—Even the greatest genius won't go far if he tried to owe everything to his own internal self. But many very good men do not

comprehend that and they grope in darkness for half a life with their dream of originality... I by no means owe my work to my wisdom alone, but a thousand things and persons around me who provided me with material. There were fools and sages, minds enlightened and narrow, childhood, youth and mature age—all told me what they felt, what they thought, how they lived and worked and what experience they had gained ; and I had nothing further than to put out my hand and reap what others had sown for me. অন্যত্র তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী Winckelmann, Lessing, Herder প্রভৃতির নিকট তাঁর ঋণ তিনি বারবার স্বীকার করেছেন।—কিন্তু তবু এ সত্য যে গ্যেটে যদি অপরিসীমকীর্ত্তিমণ্ডিত গ্যেটে না হতেন তাহলে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীদের মাহাত্ম্য অমন পরিকীর্ত্তিত হবার সম্ভাবনা কমই ঘট্‌ত—যেমন, কোনো পরিবারকে লোক-চক্ষুতে গৌরবমণ্ডিত করেন তার বহু স্বল্পকীর্ত্তি সন্তান নন, তার একজন অতুলকীর্ত্তি সন্তান। তাই গ্যেটে নিজে তাঁর মাহাত্ম্য-বিশ্লেষণে উদাসীন হলেও তাঁকে যাঁরা বুঝতে চান তাঁদের পক্ষে সে-ঔদাসীন্য অসার্থক।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে Frankfort নগরে এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে গ্যেটের জন্ম হয়। তাঁর আত্মচরিতে তিনি তাঁর বাল্যজীবনের ছবি নিপুণ হস্তে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর সেই বাল্য-কাহিনীতে বেশী করে চোখে পড়ে দুইটি ব্যাপার—তাঁর স্বভাবদত্ত প্রতিভা আর তাঁর পিতার শিক্ষা-ব্যবস্থা।—তিনি যখন সাত আট বৎসরের বালক তখন এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন,

এই ঘটনা তাঁর বালক-মনের উপরে গভীর রেখাপাত করে। সবারই মুখে যিনি দয়াল প্রেমময় ইত্যাদি নামে পরিকীর্ত্তিত তাঁরই সামনে এমন ধ্বংস কি করে সম্ভবপর, সেই চিন্তায় তাঁর চিত্ত কিছুদিন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর স্বভাবতঃ-সৌন্দর্য্যানুরাগী মনে এ দুশ্চিন্তার ভার স্থায়ী হয় নাই।—তার উপর ধর্ম্মসম্বন্ধে বহু বাদানুবাদ তিনি অনেক সময়েই শুনতেন। এই সব থেকে ইহুদি-পুরাণের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ক্রোধপরায়ণ ঈশ্বরে অপ্রত্যয় ও প্রকৃতির অধীশ্বর শান্ত সুন্দর ঈশ্বরে প্রত্যয় তাঁর বালক-মনে প্রবল হতে থাকে। কিন্তু এই ঈশ্বরকে তিনি কেমন করে তাঁর অন্তরের পূজা নিবেদন করবেন? তাঁর পিতা বহু ধাতুদ্রব্য সংগ্রহ করেছিলেন, তিনি ঠিক করলেন সেই সব ধাতুদ্রব্য প্রকৃতির বৈচিত্র্যের প্রতীকস্বরূপ একখানি সুদর্শন কাষ্ঠখণ্ডের উপরে সাজাবেন। কিন্তু কেমন করে মানুষের মনের স্তব পরিব্যক্ত হবে? শেষে ঠিক হলো তাঁর ছবি আঁকার Pastel পেন্সিল সেই সব ধাতুদ্রব্যের উপরে দাঁড় করিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেবেন, তা থেকে যে ধূম কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠ্‌বে সেই হবে মানুষের মনের স্তবের প্রতিচ্ছবি।—এক প্রভাতে তিনি এইভাবে ঈশ্বরের প্রতি স্তুতি নিবেদন করলেন—Pastel পেন্সিলে আগুন ধরালেন উদীয়মান সূর্য্যের দিকে আতস-কাচ ধরে'। কিন্তু এই স্তব নিবেদনের এক মন্দ ফল ফলেছিল—Pastel পেন্সিল পুড়ে গিয়ে সেই সুদর্শন কাষ্ঠখণ্ডে আগুন ধরেছিল, আর তাতে তার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এর উপরে গ্যেটে একটি সুগভীর মন্তব্য করেছেন—The accident might almost be considered a hint and warning of the danger there always is in wishing to approach the Deity in such a way.—তাঁর বাল্য-জীবনের

অপর একটি লক্ষ্যযোগ্য ঘটনা এই :—একদিন এক স্কুলে তাঁর সহপাঠীরা এই বলে তাঁকে জব্দ করতে চেষ্টা করে যে তাঁর পিতা তাঁর পিতামহের ছেলে নন, অন্য কোনো বড় লোকের ছেলে (তাঁর পিতামহ দর্জ্জি-ব্যবসায়ী ছিলেন)। সঙ্গীদের এই নির্ম্মম কথার উত্তরে বালক গ্যেটে শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন—এ যদি সত্য হয় তাতেই বা এমন কি ক্ষতি ; জীবন এমন এক মহা দান যে এর জন্য কার কাছে কে ঋণী সে কথা না ভেবেও পারা যায়, কেননা এতটুকু তো সত্য যে ঈশ্বরের কাছ থেকেই তা' এসেছে, আর তাঁর সামনে সবাই সমান।

তাঁর পিতা উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন ; কিন্তু নিজে জীবনে বেশী কিছু করতে পারেন নাই। তাঁর ব্যর্থ জীবন তাঁর পুত্রের ভিতর দিয়ে সার্থকতা লাভ করুক এই ছিল তাঁর সাধনা। পুত্রকে প্রায় সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ করবার আয়োজন তিনি করেছিলেন। কলেজে প্রবেশের পূর্ব্বে চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সে গ্যেটে মাতৃভাষা ভিন্ন লাটিন, ইতালীয়, হিব্রু, গ্রীক, ফরাসী ও ইংরেজী শিখেছিলেন, এর উপর চিত্রাঙ্কন, নৃত্যগীত, অসিচালনা, উদ্যানরচনা ইত্যাদিতেও অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু প্রথমে Leipsig-এ গিয়ে তিনি তা করেন নাই। পরে Strasburg-এ তিনি আইন অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রাণের সামগ্রী বরাবরই ছিল কাব্যচর্চ্চা ও চিত্রাঙ্কন।

গ্যেটের সাহিত্যিক গুরুদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের সাহায্যে তাঁর জ্ঞান দিন দিন গভীরতর হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর কাব্যের সত্যকার উৎস তাঁর এই গুরুদের প্রেরণা তত নয় যত তাঁর নিজের প্রণয়-ব্যাপার। সেই প্রেমের দহন তিনি সারাজীবন ভোগ

করেছেন। বাস্তবিক, গ্যেটের ভিতরে একই সঙ্গে দুই অদ্ভুত ধারা যথেষ্ট লক্ষ্যযোগ্য—একটি জ্ঞানান্বেষণ, অপরটি প্রেমবিধুরতা।

গ্যেটের প্রণয়-কাহিনী তাঁর জীবন ও কাব্যের ইতিহাসে খুব বড় জায়গা দখল করে আছে। কিন্তু এখানে তাঁকে ভুল বোঝা এতই স্বাভাবিক যে তাঁর স্বদেশবাসীরাও বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁকে এ ব্যাপারে নিকৃষ্ট রঙে রঞ্জিত করে এসেছেন। আমাদের জন্য ব্যাপারটী আরো কঠিন এইজন্য যে আমাদের সংস্কার অনেক বিভিন্ন, তা যতই কেন আমরা ইয়োরোপের প্রতি প্রীতি-সম্পন্ন না হই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যেতে পারে Frau Von Stein-এর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী সম্বন্ধ। তাঁর চরিতাখ্যায়কদের কেউ কেউ বলেছেন, গ্যেটে ও Von Stein-পত্নীর সম্বন্ধ মোটের উপর একটি প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্বন্ধ, তার বেশী কিছু নয়; অপরে এ মত আদৌ গ্রাহ্য করেন নাই। তেমনিভাবে জটিল বৃদ্ধবয়সে যুবতী বন্ধুপত্নী Marianne Von Willemer-এর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ—যা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল হাফিজের অনুসরণে তাঁর সুবিখ্যাত West Eastern Divan. কিন্তু এর জন্য যাঁরা তাঁকে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বলতে চান তাঁদের মত গ্রহণ করতে আমাদের বাধে এইজন্য যে কবির অন্তরাত্মা প্রতিবিম্বিত হয় যাতে সেই কাব্যে গ্যেটে যে প্রেমের ছবি অঙ্কিত করেছেন তাতে ফুটে রয়েছে এক আশ্চর্য্য পবিত্রতা। তাঁর Sorrows of Werther-এ ওয়ের্থার Albert-এর বিবাহিতা Charlotte-র প্রেমে আত্মহারা; সে এক জার্মান "মজনু"; কিন্তু সেই Werther-ই এক জায়গায় বলছেন—"...Is not my love for her the purest, most holy...has my soul ever been sullied by a single sensual desire?" তাঁর "Elective affini-

ties" গ্রন্থে নায়ক Eduard তাঁর স্ত্রীকে বিস্মৃত হয়ে Ottile-র প্রেমে পাগল হয়েছেন ; কিন্তু Ottile তাঁর কাছে দেববিগ্রহের মতো পবিত্র, Ottile-র একটু ইঙ্গিতে কঠোরতম সংযমে তিনি নিজেকে বাঁধছেন।—ক্রোচে বলেছেন, Faust প্রথম খণ্ডে Margaret-এর সঙ্গে Faust-এর সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা বেশী প্রকাশ পেয়েছে, Faust তাঁর সমস্ত জ্ঞানান্বেষণ বিস্মৃত হয়ে বৃদ্ধা দূতীর সাহায্যে Margaret-কে আয়ত্ত করছেন। দূতীর মধ্যবর্ত্তিতাই যদি ক্রোচের কাছে প্রধান আপত্তিকর ব্যাপার হয় তবে সেই কালের দোহাই দিয়ে সহজেই তাঁকে অনেকখানি নিরুত্তর করা যেতে পারে। তা ছাড়া, প্রথম কয়েক দৃশ্যের সেই বিশ্বজ্ঞানের পিপাসু সুন্দর - ও সবল-চিত্ত Faust যে পরে বদ্‌লে কামুক হয়ে গেছেন তা সত্য নয়। Margaret-এর প্রেমে বাস্তবিকই তিনি আত্মহারা ; Margaretএর কক্ষে গোপনে প্রবেশ করে তিনি তাঁর নিজের ভিতরে এক রহস্যময় পরিবর্ত্তন অনুভব করছেন :—

"......And I ? What drew me here with power ?
How deeply am I moved, this how !
What seek I ? Why so full my heart and sore ?
Miserable Faust ! I know thee now no more.

Is there a magic vapour here ?
I came with lust of instant pleasure,
And lie dissolved in dreams of love's sweet leisure...."

* Faust I—p. 85—Bayard Taylor's Version.

তাঁর Tasso, Iphigenie, প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেও এই ধরণের প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু এম্‌নি করে তাঁর পক্ষ সমর্থন করলেও আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের কথা ছেড়ে দিয়ে শিক্ষিত-সাধারণকে নিয়েও নরনারীর এমন সম্বন্ধ কল্পনা করা খুব সহজ কি? এই সুন্দর স্বেচ্ছাচার আমাদের দেশে হিন্দু দেবদেবীর লীলায় বেশ আছে, মুসলমানের বেহেশ্‌তের প্রচলিত ধারণায় খানিকটা আছে, কিন্তু এরই ভিতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে শ্রেয়ে পৌঁছানো——এ আজো আমাদের সহজ ধারণার বহির্ভূত। † —কেউ কেউ বলেছেন, গ্যেটের ভিতরে 'পাপ বোধ' 'অন্যায় বোধ' এসব ছিল না, মানুষের জন্য বিশেষ কোনো দরদ তিনি অনুভব করতেন না, যেমন Amiel বলেছেন—"He is a Greek of the great time, to whom the inward crises of the religious consciousness are unkown......he takes no more interest than Nature herself in the disinherited, the feeble, and the oppressed. ......কিন্তু এ মত যে সত্য নয় তা Amiel নিজেই সেই দিনের ডায়রীর শেষের দিকে ব্যক্ত করেছেন—"One must never be too hasty in judging these complex natures." ‡ প্রকৃতির সমস্ত ভাঙ-চুর ছাপিয়ে জাগে প্রাণের সবুজ উৎসব,—আমাদের মনে হয় গ্যেটের প্রতিভা ছিল প্রকৃতিরই

† তবে ব্যাপারটি অন্য দিক দিয়েও ভাবা যেতে পারে। নারীর ব্যক্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না; সেই ব্যক্তিত্ব স্বীকার করলে গ্যেটের জীবন ও প্রয়াস হয়ত মানুষের স্বাভাবিক জীবনের ব্যাপার বলেই আমরা ধারণা করতে পারব।

‡ Amiel's Journal—p. 187.

মতো অপরিসীম বীর্য্যবন্ত, তাই তাঁর ভিতরকার সমস্ত দুঃখ-বিপত্তি বেদনা বিক্ষোভ আত্মগোপন করেছিল এক পরম রমণীয় প্রফুল্লতার অন্তরালে। এই সম্পর্কে গ্যেটে নিজে অন্য একটি কথাও বলেছেন— Only he who has been the most sensitive can become the hardest and coldest of men, for he has to encase himself in triple steel......and often his coat of mail oppresses him.

গ্যেটের ভিতরে একই সঙ্গে প্রেমবিধুরতা ও জ্ঞানান্বেষণ বিদ্যমান এর ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে বহু কথা বলবার আছে,-- গ্যেটে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের এটি বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। প্রেমে তিনি যেন একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েন আর তাঁর আর-একটি চেতনা যেন বসে বসে তাঁর মত্ততার কাহিনী সংগ্রহ করতে থাকে। এই আশ্চর্য্য বাস্তব প্রীতি, এই যেন গ্যেটে-প্রতিভার সবখানি কথা। তাঁর গুরু ও বন্ধু Merk তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন—বাস্তব (সত্য) যা তুমি তাকে দাও কাব্য-রূপ you give poetic from to the real. তাঁর কাব্যের এর চাইতে সুন্দরতর পরিচয় হয়ত আর দেওয়া যায় না। অথচ তাঁর এই বাস্তব-প্রীতি কেন তথাকথিত realism-এ (বস্তুতন্ত্রতায়) পরিণত হলো না সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন:—প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পীর সম্বন্ধ দ্বিবিধ; তিনি একই সঙ্গে তার প্রভু ও দাস। দাস এই কারণে যে পার্থিব সামগ্রীর সাহায্যে তাঁকে কাজ করতে হয় নিজেকে বোঝাবার জন্য; আর প্রভু এই কারণে যে এইসব পার্থিব সামগ্রী তিনি উপায়-স্বরূপ ব্যবহার করেন তাঁর উচ্চতর উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলতে।—সমগ্রতার সাহায্যে শিল্পী তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। এই সমগ্রতা কিন্তু

প্রকৃতিতে নাই; এটি তাঁর নিজের চিত্তের ফল, অথবা বলা যায়, ফল-সঞ্চারী ঐশ্বরিক কামনা। *

গ্যেটের এই ধরণের মতামত অনুসরণ করে Dr. Rudolf Steiner একটি বই লিখেছেন, তার নাম তিনি দিয়েছেন Goethe as the founder of a new Science of Æsthetics. তার মূল কথা কতকটা এই—প্রকৃতির ভিতরে বুঝতে পারা যায় এক উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত, মানুষের জীবনে রয়েছে তারও চাইতে বৃহত্তর উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত,—শিল্পীর রচনায় তারই প্রকাশ; যেমন গেটে বলেছেন··· In that Man is placed on Nature's pinnacle, he regards himself as another whole Nature, whose task is to bring forth inwardly yet another pinnacle. For this purpose he heightens his powers, imbuing himself with all perfections and virtues, calling on choice, order, harmony, and meaning,

---

* The artist has a twofold relation to nature; he is at once her master and her slave. He is her slave in as much as he must work with earthly things in order to be understood, but he is her master, in as much as he subjects these earthly means to his higher intentions and renders them subservient.

The artist would speak to the world through an entirety; however, he does not find this entirety in nature; but it is the fruit of his own mind, or if you like it, of the aspiration of a fructifying divine breath.

and finally rising to the production of the work of art, which takes a prominent place by the side of his other actions and works. Once it is brought forth, once it stands before the world in its ideal reality, it produces a permanent effect—it produces the highest effect—for as it develops itself spiritually out of a unison of forces, it gathers into itself all that is glorious and worthy of devotion and love,and thus breathing life into the human form uplifts man above himself, cempletes the cycle of his life and activity, deifies him for the present in which the past and future are included.........

এ সম্বন্ধে গ্যেটের আরো কয়েকটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

......Occasional poems ( are ) the first and most genuine of all kinds of poetry...

......The first and last thing demanded of genius is love of truth......

......I seek in everything a point from which much may be developed..... *

Theodore Watts-Dunton Encyclopaedia Britannica-য় Poetry-শীর্ষক লেখায় কবি-দৃষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—Absolute Vision শুদ্ধদৃষ্টি ও Relative Vision

---

* Dr. R. Steiner তাঁর বইখানিতে শেষ মন্তব্য করেছেন এই :—
**Beauty is not the divine in a cloak of physical reality ; no, it is physical reality in a cloak that is divine.** (তিনি এখানে দার্শনিক Schelling-এর সৌন্দর্যতত্ত্বের প্রতিবাদ করেছেন)।

আপেক্ষিক দৃষ্টি। সেই Absolute Vision-এর দৃষ্টান্ত তিনি দেখেছেন Shakespeare-এ ও Homer-এ। Absolute Vision বলতে তিনি বুঝেছেন বস্তুর নিজস্বতার বিবৃতি। কবি নিজের রাগ-দ্বেষ একেবারে ভুলে গিয়ে কোনো বস্তু বা কোনো ব্যক্তির মর্ম্মে প্রবেশ করে তাকে বিশ্লেষণ করছেন, রূপময় করছেন। এই ভাবে সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে Absolute Vision লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর কি না, অর্থাৎ শেক্‌স্‌পীয়র ও হোমর তাঁদের Absolute Vision-এর মুহূর্ত্তেও শেক্‌স্‌পীয়রত্ব ও হোমরত্ব বিবর্জ্জিত হয়েছিলেন কি না, সে বিষয়ে তর্ক বিতর্ক চলতে পারে। তবে এই আত্মবিলোপ কবির পক্ষে মানুষহিসাবে যতখানি সম্ভবপর সেদিক দিয়ে দেখলে হয়ত সত্যকার Absolute Vision, অর্থাৎ মানুষের মনের বহু স্তরের বহু গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে Vision, গ্যেটের চাইতে শেকস্‌পীয়রে ও হোমরে বেশী নয়। কিন্তু সাহিত্যের প্রচলিত শাস্ত্র অনুসারে এ হয়ত blasphemy—"কাফেরী কালাম" —তাই বেশী কিছু না বলাই শোভন।

অল্প বয়সেই গ্যেটে বলেছিলেন—আমি প্রকৃতির মতো অকৃত্রিম হব, ভাল হব, মন্দ হব, তোমাদের কোনো আদর্শ আমাকে বাধা দিতে পারবে না ( All your ideals shall not prevent me from being genuine, and good and bad—like Nature ). এই যাঁর সাধনা প্রচলিত কথায় যাকে বলা হয় কবিত্ব, কাব্য-সৌন্দর্য্য, তাতেই যে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন তা সম্ভবপর নয়। ঘটেছেও তাই; গ্যেটে শুধু কবি নন, তিনি বিজ্ঞানবিৎ ( বিজ্ঞানে তাঁর দান স্বীকৃত হয়েছে ), চিত্র-সমঝদার, শেষ বয়সে সঙ্গীত-সমঝদার, ধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞ, এমন-কি মরমী-সাধনার সঙ্গেও সুপরিচিত। তাঁর চিত্তের

এই বিরাটত্বের জন্যই জনৈক লেখক তাঁকে আধুনিক জগতের সমস্ত চিন্তাশীলের গুরু বলেছেন। * গ্যেটে নিজেও বলেছেন—যিনি প্রকৃতই আমার রচনা ও চরিত্রের মর্ম্মগ্রাহী হয়েছেন তাঁকে স্বীকার করতেই হবে যে তার ফলে তিনি একপ্রকার চিত্তের অবন্ধন লাভ করেছেন। †

প্রচলিত ধর্ম্মে আস্থাবান না হয়েও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সব কথা তিনি বলেছেন তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর—ভাবুকের জন্য আনন্দের অফুরন্ত প্রস্রবণ। তাঁর Faust-এর সেই "...who dare express Him ..." ইত্যাদি সুবিখ্যাত, এভিন্ন অন্যান্য সুন্দর উক্তিও আছে, যেমন "... what know we of the idea of the Divinity? and what can our narrow ideas tell of the Highest Being? Should I, like a Turk, name it with a hundred names, I should still fall short and in comparison with the infinite attributes, have said nothing." অথবা—"Let men continue to worship Him Who gives the ox his pasture and to man food and drink, according to his need.

---

* ......we are all disciples of Goethe whether we know it or not, and any liberal mind has but to be brought into contact with the master to realize that inevitable discipleship . ..."John Macy—The Story of the World's Literature.

† "...And any one who has really learnt to understand my works and my character is bound to acknowledge that he has thereby attained to a certain freedom of the spirit."

But I worship Him Who has filled the world with such a productive energy, that if only the millionth part became embodied in living existences the globe world so swarm with them that War, Pestilence, Flood, and Fire would be powerless to diminish them. That is my God." তাঁর আর একটী উক্তিও প্রণিধানযোগ্য—যাঁরা ধর্ম্মপ্রাণ সৃষ্টি শুধু তাঁদের দ্বারাই সম্ভবপর only religious men can be creative.

গ্যেটের ভিতরে স্বজাতিপ্রেমের তীব্রতা ছিল না। এজন্য তাঁকে কম নিন্দা ভোগ করতে হয় নাই। কিন্তু দার্শনিক ক্রোচে এতে মহা আনন্দিত হয়েছেন—"......I consider it singularly fortunate that among all the sublime poets, perennial sources of deep consolation, there should yet be one who, possessing a knowledge of human nature in all its aspects, such as no other poets ever possessed, nevertheless keeps his mind above and beyond political sympathies and the inevitable quarrels of nations .." এ সম্বন্ধে গ্যেটে নিজে বহু কথা বলেচেন, "National literature is now rather an unmeaning term; the epoch of world literature is at hand, and each one must try to hasten its approach..." অন্যত্র Altogether national hatred is something peculiar. You will always find it strongest and most violent where there is the lowest degree of culture. But there a degree where it vanishes altogether, and where one stands to a certain extent above nations and feels the weal or woe of a neighbouring people

as if it had happened to one's own. This degree of culture was conformable to my nature, and I had become strengthened in it long before I had reached my sixtieth year.

গ্যেটে সম্বন্ধে যে ক'জন আলোচকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে তাঁদের কেউই কয়েক শত পৃষ্ঠার কমে তাঁদের বক্তব্য শেষ করতে পারেন নাই। তবু তাঁদের লেখা ফেনানো লেখা নয়। তাঁর সুদীর্ঘ জীবন-কাহিনী, তাঁর কাব্যের কিছু কিছু পরিচয়, আপাততঃ অকথিতই রইল।

গ্যেটে-সমুদ্রের হাওয়া মানস-স্বাস্থ্যের জন্য অমূল্য, এই একটী কথাই বলতে চেষ্টা করেছি হয়ত।

*

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। চৈত্র, ১৩৩৬

# রবীন্দ্রনাথের গান

প্রবাহিণী, গীত-মালিকা, কেতকী. শেফালি ও বসন্ত অবলম্বনে লিখিত ]

রবীন্দ্রনাথের সুর-সৃষ্টিতে মৌলিকতা অনেকখানি। কিন্তু সেই সুর বাদ দিয়ে কবিতা-হিসাবেও তাঁর গানগুলো পড়া যেতে পারে, আর পড়ে যে-আনন্দ পাওয়া যায় তার স্বাদ বেশ নূতন রকমের। এগুলো যে রবীন্দ্রনাথেরই রচনা এ-সম্বন্ধে ভুল হবার সম্ভাবনা অবশ্য নেই, তবু রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতার সঙ্গে, এমন কি গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির কবিতার সঙ্গে তুলনায়ও এ-সবের পার্থক্য চোখে পড়তে দেরী হয় না।

গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য প্রভৃতির কবি তাঁর গভীর আত্মিক অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বিচার-পরায়ণও বটেন। কোনো বিশেষ মতবাদে পৌঁছা অবশ্য কখনো তাঁর কাম্য হয়ে ওঠে নাই, তবু নিজে যখন জীবনের পথে সত্যকার চলা চলতে চাচ্ছেন তখন তাঁর চারপাশের লোকের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে তাঁর পার্থক্যটি সহজেই যে তাঁর ভাবনার বিষয় হবে এ স্বাভাবিক। এই গানগুলোর ভিতরে সেই বিচার-বিশ্লেষণের ভাব নাই বল্লেই চলে। তাঁর নিজের বিশেষ একটি ভাব-মুহূর্ত্ত, প্রকৃতির বিশেষ একটি রূপ, এই সবই আশ্চর্য্য হাল্কা হাতে এঁকে এঁকে তিনি চলেছেন। বাংলা ভাষা এক অদ্ভুত-সৌন্দর্য্য-মাখা সঙ্কেত-প্রাণ ভাষা হয়ে উঠেছে তাঁর হাতে।

তাঁর এই সব গানের সম্পর্কে বাংলার বাউল সঙ্গীতের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু অবন্ধন-প্রিয় বাউলের কেমন-একটি বিশেষ ঝোঁক এক সুস্পষ্ট তত্ত্বের পানে। এই সব গানের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নিতান্তই অ-রূপের রূপের শিল্পী।—

পরাণ আমার বাঁধন হারায়
নিশীথ রাতের তারায় তারায়
আকাশ আমায় কয় কী যে কয় কেইবা জানে ॥

অথবা—

নিদ্রাহারা রাতের এ গান বাঁধব আমি কেমন সুরে ?
কোন রজনীগন্ধা হতে আনব সে তান কণ্ঠে পুরে ॥
সুরের কাঙাল আমার ব্যথা—
ছায়ার কাঙাল রৌদ্র যথা,—
সাঁঝ সকালে বনের পথে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে ॥

এই সব গানের রচয়িতা যে ভক্ত বা সত্যান্বেষী নন তা নয়, কিন্তু বিশেষভাবে তিনি শিল্পী ; তাঁর ভক্তের অতলস্পর্শ ও রঙীন হৃদয়, তীক্ষ্ণ সত্যদৃষ্টি, এ সব তাঁকে সাহায্য করেছে এই অদ্ভুত শিল্প-চাতুর্য্য লাভে।

এই সব গানের সব চাইতে বড় সংগ্রহ প্রবাহিণীতে গানগুলোকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে—গীতগান, প্রত্যাশা, পূজা, অবসান, বিবিধ ও ঋতু-চক্র। কিন্তু এই ধরণের বিভাগের চাইতে রচনার ক্রম-অনুসারে সাজালেই হয়ত পাঠকদের বেশী উপকার হতো। সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম, ভাবের খেলা, ঘাত-প্রতিঘাত, এ সব গানে এত বেশী যে তারই জন্য কোনো ধরণের শ্রেণী-বিভাগ ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক।

'প্রত্যাশা' বিভাগ থেকে একটি গান নেওয়া যাক্—

আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি।
আমি শুনব বসে আঁধার-ভরা গভীর বাণী ॥
আমার এ-দেহ মন মিলায়ে যাক নিশীথ রাতে,
আমার লুকিয়ে ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে
থাক্‌না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি ॥

আমার সকল হৃদয় উধাও হবে তারার মাঝে
যেখানে ওই আঁধার বীণায় আলো বাজে।
আমার সকল দিনের পথখোঁজা এই হল সারা
এখন দিগ্‌বিদিকের শেষে এসে, দিশাহারা
কিসের আশায় বসে আছে অভয় মানি ॥

এতে শেষের চরণে প্রত্যাশার কথা আছে বটে; কিন্তু এই কবিতার রস হয়ত প্রত্যাশারই রস নয়। কবির এই-যে সব কথা—

আমার এ দেহ মন মিলায়ে যাক নিশীথ রাতে
আমার লুকিয়ে ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে
থাক্‌না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি

অথবা

আমার সকল হৃদয় উধাও হবে তারার মাঝে
যেখানে ওই আঁধার বীণায় আলো বাজে

এ-সবে প্রত্যাশার চাইতে কেমন-এক অ-প্রত্যাশার সৌন্দর্য্য উপভোগই আমাদের বেশী করে চোখে পড়ে। 'প্রত্যাশা' বিভাগের অন্য একটি কবিতা থেকে এ কথাটি আরো ভালো করে বোঝা যাবে।—

কেন যে মন ভোলে আমার মন জানে না।
তারে মানা করে কে আমার মন মানে না ॥
কেউ বোঝে না তারে
সে যে বোঝে না আপনারে,
সবাই লজ্জা দিয়ে যায়, সে ত কানে আনে না ॥
তার খেয়া গেল পারে
সে যে রইল নদীর ধারে।
কাজ করে সব সারা
এগিয়ে গেল কারা
আন্‌মনা-মন সে-দিক পানে দৃষ্টি হানে না ॥

'অ-প্রত্যাশা' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর প্রতি-শব্দরূপে অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে—নিঃসঙ্গতা। কিন্তু এই দুয়েরই জন্য একটুখানি ভূমিকার হয়ত প্রয়োজন।

আমাদের প্রত্যেকেরই মনের হয়ত এই দুইটি দিক আছে; এক-দিকে আমরা দশের সঙ্গে যুক্ত—সেখানে ভাল মন্দের লড়াই, সঞ্চয় ক্ষয়, তৃপ্তি অতৃপ্তি, এ সবের আর অন্ত নাই, আর একদিকে আমরা নিতান্ত নিঃসঙ্গ—সেখানে শুধু নিঃসীম আকাশ আমাদের বন্ধু, আর কেউই নয়। সাধারণ মানুষ এই নিঃসঙ্গতা বা নিঃসীমতা কেমন-এক ভীতির চক্ষে দেখেন, কিন্তু প্রতিভাবান এতে ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন-এক গোপন পুলকও অনুভব করেন।

এই নিঃসঙ্গতা বা নিঃসীমতার রস রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতায়ও কিছু কিছু আছে। কিন্তু তা যেন এক সহজ মহিমা লাভ করেছে এই সব গানে। এমন কি নিঃসঙ্গতাই এই সব গানের প্রধান সুর বা রস বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের এক-সময়ের পরমপ্রিয় ফরাসী-ভাবুক এমিয়েলও ( Amiel ) নিঃসঙ্গতা-রসিক। তিনি সময় সময় হয়েছেন নিঃসঙ্গতার রসে একেবারে বুঁদ। তাঁর গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় Mrs. Humphry Ward তাঁর এই মানসিক লক্ষণের নাম দিয়েছেন intoxication of the infinite অসীমের মাদকতা। রবীন্দ্রনাথ নিঃসঙ্গতার প্রেমিক; কিন্তু এর ভিতরে বুঁদ হয়ে যাওয়া, এটি তাঁতে হয় নাই। বুঁদ হয়ে যাবার জন্য কেমন-এক আগ্রহ সময় সময় তাঁর ভিতরে জেগেছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর ব্যক্তিত্বের রস তাঁর জন্য মধুর রয়ে গেছে। 'অনন্ত'-সমুদ্রের কূলে হাওয়া খাওয়া তাঁর খুব হয়েছে, সময় সময় তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বার দুঃসাহসও তাঁতে

জেগেছে, কিন্তু একটুখানি সাঁতার দিয়ে আবার কূলে উঠে সে-সমুদ্রের পানে তিনি চেয়ে দেখেছেন।

'অনন্ত'-সরোবরে 'আমিত্ব'-কমলের এম্‌নি এক পরম নিগূঢ় রূপ আর একজন কবির ভিতরে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে—'তিনি 'ইয়োরোপের কবিকুলগুরু' গ্যেটে।

বলেছি, নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথের এইসব গানের প্রধান সুর। এ কথাটি অন্যভাবেও বলা যেতে পারে। একটি গান নেওয়া যাক—

তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে
দেবে কিগো বাসা আমায় একটি ধারে ॥
আমি ভরব ধ্বনি কানে,
আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে,
সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায় তার বাঁধিব বারে বারে ॥

আমার নীরব বেলা সেই তোমারি সুরে সুরে
ফুলের ভিতর মধুর মতো উঠবে পুরে।
আমার দিন ফুরাবে যবে
যখন রাত্রি আঁধার হবে
হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে ॥

এখানে কবি আর তাঁর প্রেমাস্পদের কথা আছে বটে, কিন্তু এই কবিতার শেষের ক'টি চরণের যে আবেদন

(আমার নীরব বেলা সেই তোমারি সুরে সুরে
ফুলের ভিতর মধুর মতো উঠবে পুরে।
আমার দিন ফুরাবে যবে
যখন রাত্রি আধার হবে
হৃদয়ে মোর গানের তারা উঠবে ফুটে সারে সারে)

--আর এই ক'টি চরণেই হয়ত এই কবিতার বিশেষ সৌন্দর্য্য ফুটেছে—সেটি হয়ত নিঃসঙ্গতারই আবেদন। মিলন, মিলনের আশা, এ-সব যে কবির অবাঞ্ছিত তা বলব না, কিন্তু শুধু নিঃসঙ্গতারই মাধুর্য্য তাঁর জন্য কম নয়।

এই ধরণের আরো কয়েকটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে—

কূল থেকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে,—
সাগর মাঝে ভাসিয়ে দিলেম পালটি তুলে ॥
যেখানে ওই কোকিল ডাকে ছায়াতলে—
সেখানে নয়।
যেখানে ওই গ্রামের বধূ আসে জলে
সেখানে নয়।
যেখানে নীল মরণ-লীলা উঠছে দুলে
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে ॥
এবার বীণা তোমায় আমায় আমরা একা।
অন্ধকারে নাইবা কারে গেল দেখা!
কুঞ্জবনের শাখা হতে যে ফুল তোলে
সে ফুল এ নয়।
বাতায়নের পাতা হতে যে ফুল দোলে
সে ফুল এ নয়।
দিশাহারা আকাশ-ভরা সুরের কূলে
সেইদিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে ॥

পাখী আমার নীড়ের পাখী অধীর হলো কেন জানি।
সে কি শোনে আকাশ কোণে ভোরের আলোর কানাকানি ॥
ডাক উঠেছে মেঘে মেঘে
অলস পাখা উঠল জেগে
লাগল তারে উদাসী ঐ নীল গগনের পরশখানি ॥

আমার নীড়ের পাখী এবার উধাও হলো আকাশ মাঝে।
যায়নি কারো সন্ধানে সে, যায়নি যে সে কোনো কাজে।
গানের ভরা উঠল ভরে
চায় দিতে তাই উজাড় করে
নীরব গানের সাগর মাঝে আপন প্রাণের সকল বাণী ॥

মেঘের কোলে কোলে যায়রে চলে বকের পাঁতি।
ওরা ঘরছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ঐ গাঁথি গাঁথি ॥
সুদূরের বীণার স্বরে
কে ওদের হৃদয় হরে,
দুরাশার দুঃসাহসে উদাস করে—
সে কোন্ উধাও হাওয়ার পাগলামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি ॥
ওদের ঘুম ছুটেছে ভয় টুটেছে একেবারে
অলক্ষ্যেতে লক্ষ্য ওদের—পিছন পানে তাকায় নারে।
যে বাসা ছিল জানা
সে ওদের দিল হানা,
না-জানার পথে ওদের নাইরে মানা;
ওরা দিনের শেষে দেখেছে কোন্ মনোহরণ আঁধার রাতি ॥

গহন রাতে শ্রাবণ ধারা পড়িছে ঝরে
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে?
এখনো দুটি আঁখির কোণে যায়রে দেখা
জলের রেখা,
না-বলা বাণী রয়েছে যেন অধর ভরে ॥
না হয় যেয়ো গুঞ্জরিয়া বীণার তারে
মনের কথা শয়ন-দ্বারে ॥
না হয় রেখো মালতী-কলি শিথিল কেশে
নীরবে এসে,
না হয় রাখী পরায়ে যেয়ো ফুলের ডোরে
কেন গো মিছে জাগাবে ওরে ॥

এ সব কবিতা সম্পর্কে কেউ যদি বলেন, এ-সবে বিরহের প্রকাশ বড় মধুর হয়েছে, তাহলে সে-কথার প্রতিবাদ না করে' শুধু এই কথাটি বলব—এ সব কবিতায় অনুভাবকের নিজের ব্যক্তিত্বেরই যে এক গূঢ় মধুর আস্বাদ আছে তার পানে চোখ না রাখলে কবিতাগুলোর প্রতি অবিচার করা হবে। অন্যের জন্য কবি আকুল যতখানি তার চাইতে 'নিজের'ই মনোহারিত্বে মুগ্ধ তিনি বেশী।

২

কিন্তু কাব্যের রস-আস্বাদনে কোনো সূত্রের সাহায্য একান্তভাবে গ্রহণ করা বিড়ম্বনা বৈ আর কি। অতএব 'নিঃসঙ্গতা' 'বিরহ' ইত্যাদি কথা থাকুক।

অন্যান্য বহুভাবের কবিতাও প্রবাহিণী গীতমালিকা প্রভৃতি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। যেমন—প্রেমের কবিতা—

অলকে কুসুম না দিয়ো
শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো॥
কাজলবিহীন সজল নয়নে
হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ো॥
আকুল আচলে পথিক-চরণে
মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো।
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ
নিদয়া নীরবে সাধিয়ো॥
এস এস বিনা ভূষণেই
দোষ নেই তাহে দোষ নেই।
যে আসে আসুক ঐ তব রূপ
অযতন-ছাঁদে ছাঁদিয়ো
শুধু হাসিখানি আঁখি-কোণে হানি
উতলা হৃদয় ধাঁধিয়ো॥

অথবা

নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া
তোমার অনল দিয়া ॥
কবে যাবে তুমি সমুখের পথে দীপ্ত শিখাটি বাহি,
আছি তাই পথ চাহি ॥
পুড়িবে বলিয়া রয়েছে আশায় আমার নীরব হিয়া
আপন আঁধার নিয়া ॥
নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া ॥

কিন্তু এই সব গানের প্রিয়া আর সুফী-কবিদের 'মা'শুক' ( beloved ) হয়ত একই দেশের মোহিনী।

প্রবাহিণীর একটি কবিতায় প্রকাশ-ভঙ্গির সৌন্দর্য্য অত্যদ্ভুত। চিন্তাধারা সুপরিচিত, কিন্তু নূতন প্রকাশ-ভঙ্গিমার জন্য এ কত নূতন!—

মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল মিলিয়ে থাকে
মাটি পায়না তাকে ॥
কবে কাটিয়ে বাঁধন পালিয়ে যখন যায় সে দূরে,
আকাশ পুরে,
তখন কাজল মেঘের সজল ছায়া শূন্যে আঁকে
মাটি পায়না তাকে ॥
শেষে বজ্র তারে বাজায় ব্যথা বহ্নি জ্বালায়,
ঝঞ্ঝা তারে দিগ্‌বিদিকে কাঁদিয়ে চালায়।
তখন কাছের ধন যে দূরের থেকে কাছে আসে
বুকের পাশে
তখন চোখের জলে নামে সে যে চোখের জলের ডাকে
মাটি পায় রে তাকে ॥

এই গানগুলোতে কিন্তু একটি খুব চোখে পড়বার মতো ব্যাপার এই যে যে-মাটির প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ এত বেশী একান্তভাবে সেই মাটির মহিমা-সম্বন্ধে গান তাঁর খুব কম। "এইত ভাল লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়" অথবা "যেদিন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে" প্রভৃতি মাটির মহিমাজ্ঞাপক কয়েকটি সুন্দর কবিতা এই সব সংগ্রহে আছে,কিন্তু তার সংখ্যা খুব কম। কেউ কেউ বলতে পারেন, ঋতু-সম্বন্ধে তাঁর যে অজস্র গান সে-সব তো মাটিরই মহিমার গান। কিন্তু বাস্তবিক হয়ত তা নয়। ঋতুর যত সমারোহ সে মাটিরই সমারোহ একথা কবি ভাল করেই জানেন, তিনি নিজেও বসে আছেন মাটিরই উপরে, কিন্তু এই সমারোহ তাঁর চোখে সার্থক হয়েছে কোন্ সুদূর থেকে আসা আলোর ধারায়, আর সেই সুদূরের প্রতি তাঁর দৃষ্টি প্রায় নির্নিমেষ।

প্রবাহিণীর 'পূজা' বিভাগের কবিতাগুলোর চাইতে গীতিমাল্যের অনেক কবিতা আমাদের ভাল লাগে বেশী, পূজার ভাবটি সেখানে যেন আরো নিবিড়, তবু এ বিভাগেও কয়েকটি ভারি সুন্দর কবিতা আছে।

তোমায় কিছু দেবো বলে চায় যে আমার মন
নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন।
যখন তোমার পেলাম দেখা
অন্ধকারে একা একা
ফিরতেছিলে বিজন গভীর বন—
ইচ্ছা ছিল একটি বাতি জ্বালাই তোমার পথে
নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন

দেখেছিলেম হাটের লোকে তোমারে দেয় গালি,
গায়ে তোমার ছড়ায় ধুলাবালি।
অপমানের পথের মাঝে
তোমার বীণা নিত্য বাজে
আপন সুরে আপনি নিমগন।
ইচ্ছা ছিল বরণমালা পরাই তোমার গলে
নাইবা তোমার থাক্‌ল প্রয়োজন ॥

দলে দলে আসে লোকে রচে তোমার স্তব
নানা ভাষায় নানান কলরব।
ভিক্ষা লাগি তোমার দ্বারে
আঘাত করে বারে বারে
কত যে শাপ কত যে ক্রন্দন।
ইচ্ছা ছিল বিনাপণে আপনাকে দিই পায়ে
নাই বা তোমার থাকল প্রয়োজন ॥

তোমার দ্বারে কেন আসি
ভুলেই যে যাই—
কতই কি চাই
দিনের শেষে ঘরে এসে লজ্জা যে পাই ॥
সে সব চাওয়া সুখে দুখে
ভেসে বেড়ায় কেবল মুখে,
গভীর বুকে
যে চাওয়াটি গোপন তাহার কথা যে নাই ॥
বাসনা সব বাঁধন যেন কুঁড়ির গায়ে
ফেটে যাবে ঝরে যাবে দখিন বায়ে।
একটি চাওয়া ভিতর হতে
ফুটবে তোমার ভোর আলোতে—
প্রাণের স্রোতে
অন্তরে সেই গভীর আশা বয়ে বেড়াই ॥

এই সব গানের অল্প কয়েকটীতে তত্ত্ব-চিন্তা সুস্পষ্ট, কিন্তু সেগুলোর আলোচনা এই সম্পর্কে না হওয়াই ভাল। মোটের উপর এই সব গান নিতান্তই ক্ষণিকার গান —এক একটি আদি-অন্ত-বিবর্জ্জিত মুহূর্ত্ত রূপে রসে পরমক্ষণের মতো চিকমিক করে উঠে কোন্ অতলে গিয়ে জম্‌ছে। কবির সেই সব বিচিত্র ভাব-মুহূর্ত্তের বিস্তারিত আলোচনা এক অসম্ভব ব্যাপার। হয়ত তা' অপ্রয়োজনীয়ও, কেননা সে-সবের একান্ত প্রতীক্ষা রসিক পাঠকের অতন্দ্রিত রসবোধের। মাত্র দুটি কবিতা উদ্ধৃত হচ্ছে, যথাক্রমে তার নাম দেওয়া যেতে পারে 'অবসান' ও 'সন্ধ্যাদীপ'—

কোথা হতে শুন্‌তে যেন পাই
আকাশে আকাশে বলে যাই ॥
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে
জেগে ওঠে দীর্ঘশ্বাসে
হায়, তারা নাই তারা নাই ॥
কত দিনের কত ব্যথা
হাওয়ায় ছড়ায় ব্যাকুলতা।
চলে যাওয়ার পথ যেদিকে
সেদিক পানে অনিমিখে
আজ ফিরে চাই ফিরে চাই ॥

আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা
অন্ধকারের ললাটমাঝে পরানু রাজটীকা।
তার স্বপনে মোর আলোর পরশ
জাগিয়ে দিল গোপন হরষ,
অন্তরে তার রইল আমার
প্রথম প্রেমের লিখা ॥

আমার নির্জ্জন উৎসবে
অম্বরতল হয়নি উতল পাখীর কলরবে।
যখন তরুণ রবির চরণ লেগে
নিখিল ভুবন উঠবে জেগে
তখন আমি মিলিয়ে যাব
ক্ষণিক মরীচিকা॥

ঋতু বর্ণনায় এই ভাব-বৈচিত্র্য খুব স্পষ্ট।

৩

রবীন্দ্রনাথ বর্ষার কবিরূপে প্রসিদ্ধ। কিন্তু গ্রীষ্ম, শরৎ ও বসন্ত-বর্ণনায়ও তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ।

এই গানগুলোতে ঋতু-বর্ণনার যে বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বস্তু সেটি হচ্ছে কবির নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গি ও বর্ণন-ভঙ্গি। ঋতুর সহজ সরল বর্ণনা এসব আদৌ নয়। তাঁর এই নূতন মনের উপরে ঋতুর বিভিন্ন রূপের ছায়াপাত, প্রভাব, কেমন হয়েছে এসব তারই বর্ণনা মুখ্যতঃ, অথচ ঋতুর বিভিন্ন ভাবও ফুটেছে সুন্দর। নিদাঘ সম্পর্কে দুটি কবিতা নেওয়া যাক—

হে তাপস, তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে
মন আজি মোর উদাস বিভোর কোন্ সে ভাবের বশে॥
তব পিঙ্গল জটা
হানিছে দীপ্ত ছটা,
তব দৃষ্টির বহ্নিবৃষ্টি অন্তরে গিয়ে পশে॥
বুঝি না কিছু না জানি
মর্ম্মে আমার মৌন তোমার কি বলে রুদ্র বাণী।
দিগ্‌দিগন্ত দহি
দুঃসহ তাপ বহি
তব নিশ্বাস আমার বক্ষে রহি রহি নিশ্বসে॥

সারা হয়ে এল দিন
সন্ধ্যামেঘের মায়ার মহিমা নিঃশেষে হবে লীন।
দীপ্তি তোমার তবে
শান্ত হইয়া রবে
তারায় তারায় নীরব মন্ত্রে ভরি দিবে শূন্য সে ॥

নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা।
খেল খেল তব নীরব ভৈরব খেলা ॥
যদি ঝরে পড়ে পড়ুক পাতা
ম্লান হয়ে যাক মালা গাঁথা
থাক জনহীন পথে পথে মরীচিকা-জাল ফেলা ॥
শুষ্ক ধূলায় খসে-পড়া ফুলদলে
ঘূর্ণী আঁচল উড়াও আকাশ তলে।
প্রাণ যদি কর মরুসম
তবে তাই হোক্, হে নির্ম্মম,
তুমি একা আর আমি একা কঠোর মিলন মেলা ॥

নিদাঘের "দারুণ দাহনবেলা" দুটিতেই ফুটেছে, কিন্তু নূতন বর্ণনভঙ্গির জন্য শেষোক্ত কবিতাটি আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করে যেন বেশী!

ঋতু-সম্পর্কিত এই সব গানে ছন্দোগতি খুবই লক্ষ্যযোগ্য। এই ছন্দোগতিই বিশেষভাবে সাহায্য করেছে ঋতুর ভাব-বৈচিত্র্য প্রকাশে।

নিদাঘের দাহনে ধরণীর অসহায়তার ছবি আমরা দেখেছি, কালবৈশাখীর হঠাৎ প্রচুর বর্ষণে তার যে ছবি তা ফুটেছে অন্য একটি গানে—

পুব সাগরের পার হতে এল কোন্ পরবাসী
শূন্যে বাজায় ঘন ঘন
হাওয়ায় হাওয়ায় সন সন
সাপ খেলাবার বাঁশী ॥

সহসা তাই কোথা হতে
কুলু কুলু কলস্রোতে
দিকে দিকে জলের ধারা ছুটেছে উল্লাসী ॥
আজ দিগন্তে ঘন ঘন গভীর গুরু গুরু
ডমরু রব হয়েছে ঐ সুরু।
তাই শুনে আজ গগন তলে
পলে পলে দলে দলে
অগ্নিবরণ নাগনাগিনী ছুটেছে উদাসী ॥

এর পরই বর্ষার বিপুল্ ও বিচিত্র আয়োজন।

বর্ষা আরম্ভ হয় নাই, শুধু রসপুষ্ট গাছপালার মাথার উপর দিয়ে বাতাসের বেগে মেঘ ভেসে যাচ্ছে, তার ছবিটি এই—

আকাশ তলে দলে দলে মেঘ-যে ডেকে যায়,
আয় আয় আয়।
জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই
যাই, যাই, যাই।
উড়ে যাওয়ার সাধ জাগে তার পুলক-ভরা ডালে
পাতায় পাতায় ॥
নদীর ধারে বারে বারে মেঘ-যে ডেকে যায়
আয় আয় আয়।
কাশের বনে ক্ষণে ক্ষণে রব উঠেছে তাই
যাই, যাই, যাই।
মেঘের গানে তরীগুলি তান মিলিয়ে চলে
পাল-তোলা পাখায় ॥

বর্ষার সূচনা হয়েছে। বর্ষণোন্মুখ অত্যন্ত কালো মেঘ, তার কোলে কোলে বিদ্যুতের চমক—এর এই মোহন মূর্ত্তি কবি এঁকেছেন—

কাঁপিছে দেহলতা থর থর।
চোখের জলে আঁখি ভর ভর॥
দোদুল তমালেরি বনছায়া
তোমারি নীলবাসে নিল কায়া,
বাদল নিশীথেরি ঝর ঝর
তোমার আঁখি পরে ভর ভর॥
যে কথা ছিল তব মনে মনে
চমকে অধরের কোণে কোণে।
নীরব হিয়া তব দিল ভরি
কী মায়া স্বপনে যে মরি মরি,
আঁধার কাননের মর মর।
বাদল নিশীথের ঝর ঝর॥

এই দুটি কবিতায় সারাদিন ঝর ঝর বৃষ্টির ছবি আঁকা হয়েছে অথচ দুটিতে পার্থক্য যথেষ্ট—

আজ আকাশের মনের কথা ঝর ঝর বাজে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে॥
দিঘির কালো জলের পরে
মেঘের ছায়া ঘনিয়ে ধরে,
বাতাস বহে যুগান্তরের প্রাচীন বেদনা যে
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে॥
আঁধার বাতায়নে
একলা আমার কানাকানি ঐ আকাশের সনে।
ম্লান স্মৃতির বাণী যত—
পল্লব-মর্ম্মরের মত
সজল স্বরে ওঠে জেগে ঝিল্লিমুখর সাঁঝে॥
সারা প্রহর আমার বুকের মাঝে॥

বাদল-বাউল বাজায়রে একতারা
সারা বেলা ধরে ঝরঝরঝর ধারা
জামের বনে ধানের ক্ষেতে
আপন তানে আপনি মেতে
নেচে নেচে হল সারা ॥
ঘন জটার ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ মাঝে,
পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নূপুর মধুর বাজে
ঘর-ছাড়ানো আকুল সুরে
উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে
পুবে হাওয়া গৃহহারা ॥

'কেতকী'র কয়েকটি গানে বর্ষার প্রবল রূপ প্রকাশ পেয়েছে—যেমন—

আবার শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে,
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে।
সূর্য্য হারায়, হারায় তারা,
আঁধারে পথ হয় যে হারা,
ঢেউ দিয়েছে নদীর নীরে।
সকল আকাশ, সকল ধরা
বর্ষণেরি বাণী ভরা।
ঝর ঝর ধারায় মাতি
বাজে আমার আঁধার রাতি,
বাজে আমার শিরে শিরে।

অথবা

আজ নাহি নাহি নিদ্রা আঁখি পাতে।
তোমার ভবন তলে, হেরি প্রদীপ জলে,
দূরে বাহিরে তিমিরে আমি জাগি জোড়হাতে।

ক্রন্দন ধ্বনিছে পথহারা পবনে
রজনী মূর্চ্ছাগত বিদ্যুত ঘাতে।
দ্বার খোলো হে দ্বার খোলো !
প্রভু করো দয়া দেহ দেখা দুখরাতে।

কিন্তু সাধারণতঃ তাঁর এই সব গানের আবেদনে কোনো প্রবলতা নাই। সেই প্রবলতার অভাবই এ-সবের এক বিশেষ সৌন্দর্য্য—যেন নিস্তরঙ্গ জলে একরাশি কুমুদ।

অপর একটি কবিতায় বর্ষার দুর্যোগ দুর্দ্দিন এ-সবের ছবি আঁকা হয়েছে সুন্দর, কিন্তু তার আবেদনে কোনো প্রবলতা নাই বল্লেই চলে—

ঝর ঝর বরিষে বারিধারা
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা ॥
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে, ডাকে কারে
জনহীন অসীম প্রান্তরে,
রজনী আঁধারা ॥

অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা রে, তিমির-দুকূলারে।
নিবিড় নীরদ গগনে গর গর গরজে সঘনে,
চঞ্চলা চপলা চমকে নাহি শশিতারা ॥

দীর্ঘ বর্ষাযাপনের পরে শরৎ-বধূর প্রসন্ন নয়ন-উন্মীলনের ছবিটি বড় মনোরম—

এবার অবগুণ্ঠন খোলো খোলো।
গহন মেঘমায়ায় বিজন বনছায়ায়
তোমার আলসে অবলুণ্ঠন সারা হোলো !

শিউলি সুরভি রাতে
বিকশিত জ্যোৎস্নাতে
মৃদু মর্ম্মর গানে তব মর্ম্মের বাণী বোলো।
বিষাদ অশ্রুজলে
মিলুক সরম হাসি
মালতী বিতান তলে
বাজুক বঁধুর বাঁশী।
শিশির সিক্ত বায়ে
বিজড়িত আলো ছায়ে
বিরহ মিলনে গাঁথা
নব প্রণয় দোলায় দোলো ॥

প্রথম শরতের কালো মেঘ ও উজ্জ্বল রৌদ্রের গানটিতে কবি জীবন-সম্বন্ধেও একটি বড় ও ভাল কথা বলেছেন ; কিন্তু সেসব মনে না এনেও এর রচনামাধুর্য্যে কত মুগ্ধ হওয়া যায়—

শ্যামল শোভন শ্রাবণ ছায়া, নাইবা গেলে
সজল বিলোল আঁচল মেলে ॥
পূব হাওয়া কয়, "ওর যে সময় গেলো চলে,"
শরৎ বলে, "ভয় কি সময় গেলো বলে,"
বিনাকাজে আকাশ মাঝে কাট্‌বে বেলা
অসময়ের খেলা খেলে ॥"
কালো মেঘের আর কি আছে দিন
ও যে হলো সাথীহীন।
পূব হাওয়া কয়, "কালোর এবার যাওয়াই ভালো."
শরৎ বলে, "মিলবে যুগল কালোয় আলো,
সাজবে বাদল সোনার সাজে আকাশ মাঝে
কালিমা ওর ঘুচিয়ে ফেলে ॥"

শরতের শিশির ও রৌদ্রের ঐশ্বর্য্য 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি' শীর্ষক সুপরিচিত গানটিতে এক চমৎকার রূপ লাভ করেছে ; প্রবাহিণীর গানগুলোতে কিন্তু শরতের আকাশ-বাতাসের চাঞ্চল্য, উদাস ভাব, এসবই বেশী পরিস্ফুট—সে-উদাসভাবে যেন কি-এক জাদু আছে—

তোমরা যা বল তাই বল আমার লাগেনা মনে।
আমার যায় বেলা যায় বয়ে কেমন বিনা কারণে ॥
এই পাগল হাওয়া
কী গান গাওয়া
ছড়িয়ে দিয়ে গেল আজি শরৎ গগনে।
সে গান আমার লাগল যে গো লাগল মনে,
আমি কিসের মধু খুঁজে বেড়াই ভ্রমর গুঞ্জনে।
ঐ আকাশ ছাওয়া
কাহার চাওয়া
এমন করে লাগে আজি আমার নয়নে ॥

হেমন্ত ও শীতের বর্ণনা এই সব গানে তেমন নাই। তার বড় কারণ হয়ত এই যে বাংলা দেশে এ দুয়ের যা' রূপ তা হচ্ছে সঞ্চয়ের রূপ—

"আয়রে মোরা ফসল কাটি......"

কিন্তু কবির এই সব গানের যা রূপ তাকে বলা যায় অপচয়ের রূপ—চঞ্চল সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মুহূর্ত্তের জন্য চোখোচোখি।

বসন্তের রূপ-বৈচিত্র্য এই সব গানে ফুটেছে বেশ। পৌষের পাতা-ঝরা শীর্ণ শাখায় বসন্তের যে আগমনী বাজছে, কবির কানে তা প্রতি-ধ্বনিত হয়েছে এই ভাবে—

সব দিবি কে সব দিবি পায় !
আয়, আয়, আয় !
ডাক পড়েছে ঐ শোনা যায়
আয় আয় আয় !

আসবে যে সে স্বর্ণরথে
জাগবি কারা রিক্তপথে
পৌষ রজনী তাহার আশায়
আয় আয় আয় !

ক্ষণেক কেবল তাহার খেলা ;
হায় হায় হায় !
তার পরে তার যাবার বেলা
হায় হায় হায় !
চলে গেলে জাগবি যবে
ধন রতন বোঝা হবে,
বহন করা হবে যে দায় !
হায় হায় হায় !

বসন্তের ঝরা পাতার গানটি বড় মর্ম্মস্পর্শী—

ফাগুনের সুরু হতেই শুক্‌নো পাতা ঝরল যত
তারা আজ কেঁদে শুধায়
"সেই ডালে ফুল ফুট্‌ল কিগো ?
ওগো কও ফুটল কত ॥"

তারা কয়, 'হঠাৎ হাওয়ায় এল ভাসি
মধুরের সুদূর হাসি—হায়,
ক্ষ্যাপা হাওয়ায় আকুল হয়ে ঝরে গেলেম শত শত ॥"

তারা কয়, "আজ কি তবে এসেছে সে
নবীন বেশে ?
আজ কি তবে এতক্ষণে জাগল বনে
যে গান ছিল মনে মনে ?
সেই বারতা কানে নিয়ে যাই চলে এইবারের মত ॥"

ঝরে-পড়ার আনন্দ নয় কেমন এক বেদনা-কাতর তৃপ্তি রয়েছে এই সব পাতার মুখে।

বসন্তের বহু রূপ কবি এঁকেছেন। যেমন, ফাল্গুনের ডাল পালা ও রঙীন ফুলের উৎসবের গান—

সহসা ডাল পালা তোর উতলা যে !
( ও চাঁপা ও করবী )
কারে তুই দেখ্‌তে পেলি
আকাশ মাঝে
জানিনা যে।
কোন্ সুরের মাতন হাওয়ায় এসে
বেড়ায় ভেসে,
( ও চাঁপা ও করবী )
কার নাচনের নূপুর বাজে
জানিনা যে !
তোরে ক্ষণে ক্ষণে চমক লাগে।
কোন্ অজানার ধেয়ান তোমার
মনে জাগে ?
কোন্ রঙের মাতন উঠল দুলে
ফুলে ফুলে
কে সাজালে রঙীন সাজে
জানিনা যে ॥

ফাল্গুন-পূর্ণিমার গান—

ভাঙল হাসির বাঁধ
অধীর হয়ে মাতল কেন
পূর্ণিমার ঐ চাঁদ।
উতল হাওয়া ক্ষণে-ক্ষণে
মুকুলছাওয়া বকুল বনে
দোল দিয়ে যায়, পাতায় পাতায়
ঘটায় পরমাদ ॥
ঘুমের আঁচল আকুল হ'ল
কি উল্লাসের ভরে!
স্বপন যত ছড়িয়ে প'ল
দিকে দিগন্তরে!
আজ রাতের এই পাগলামিরে
বাঁধবে বলে কে ঐ ফিরে,
শাল বীথিকায় ছায়া গেঁথে
তাই পেতেছে ফাঁদ ॥

বসন্তের এই সমারোহের ভিতরে মেঠো ফুলটির কথা কবি ভোলেননি—

আজ দখিন বাতাসে
নাম-না জানা কোন্ বনফুল
ফুট্‌ল বনের ঘাসে
ও মোর পথের সাথী পথে পথে
গোপনে যায় আসে ॥
কৃষ্ণচূড়া চূড়ায় সাজে,
বকুল তোমার মালার মাঝে,
শিরীষ তোমার ভরবে সাজি
ফুটেছে সেই আশে
এ মোর পথের বাঁশির সুরে সুরে
লুকিয়ে কাঁদে হাসে।

ওরে দেখ বা নাই দেখ, ওরে
যাও বা না যাও ভুলে।
ওরে নাইবা দিলে দোলা, ওরে
নাইবা নিলে তুলে।

সভায় তোমার ও কেহ নয়,
ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়
যাওয়া আসার আভাস নিয়ে
রয়েছে এক পাশে ॥
ওগো ওর সাথে মোর প্রাণের কথা
নিশ্বাসে নিশ্বাসে ॥

ক্ষণস্থায়ী বসন্তের বিদায়ের রূপটি কবি এঁকেছেন এইভাবে—

না যেয়োনা যেয়ো নাকো।
মিলন পিয়াসী মোরা
কথা রাখো কথা রাখো।
আজো বকুল আপন হারা, হায়রে—
ফুল ফোটানো হয়নি সারা,
সাজি ভরেনি,
পথিক ওগো থাকো থাকো ॥
চাঁদের চোখে জাগে নেশা
তার আলো গানে গন্ধে মেশা।
দেখ চেয়ে কোন্ বেদনায়, হায়রে—
মল্লিকা ওই যায় চলে যায়
অভিমানিনী!
পথিক তারে ডাকো ডাকো ॥

এমনি কত মুহূর্ত্ত অপরূপ হয়ে আছে এই সব গানের ভিতরে! রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনের দান দেশের কাব্যরসিকরা শ্রদ্ধায় ও

আনন্দে গ্রহণ করেছেন। তাঁর বার্দ্ধক্যের 'নিরাসক্ত যৌবনে'র এই দানও কালে কাব্য-হিসাবে পরম আদরে গৃহীত হবে সন্দেহ নাই। এই সব গানের পদগুলো যেন সৌন্দর্য্য ও আনন্দের অফুরন্ত উৎস। রূপের পূর্ণাঙ্গতা এখানেই যেন লাভ হয়েছে বিশেষভাবে।

আর একটি গান উদ্ধৃত করব। যে নিঃসঙ্গতা-প্রীতি এই সব গানের প্রধান সুর বলেছি তা হয়ত তেমন নাই এই গানটিতে। তা না থাকুক। কবি স্থির হয়ে এক অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখছেন, আমাদের সকলেরই জন্য এ-দেখা সার্থক হোক—

আমার মন চেয়ে রয় মনে মনে হেরে মাধুরী
নয়ন আমার কাঙাল হয়ে মরেনা ঘুরি।
চেয়ে চেয়ে বুকের মাঝে গুঞ্জরিল একতারা যে,
মনোরথের পথে পথে বাজল বাঁশুরী।
রূপের কোলে ঐ যে দোলে অরূপ মাধুরী॥
কূলহারা কোন্ রসের সরোবরে
মূলহারা ফুল ভাসে জলের পরে।
হাতের ধরা ধরতে গেলে, ঢেউ দিয়ে তায় দিই যে ঠেলে,
আপন মনে স্থির হয়ে রই করিনে চুরি।
ধরা দেওয়ার ধন সে ত নয় অরূপ মাধুরী॥

অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮

# শরৎ-সাহিত্য

শরৎ-সাহিত্য দুই বড় ভাগে ভাগ ক'রে দেখা যেতে পারে। প্রথম ভাগের নাম দেওয়া যেতে পারে প্রাক্-'শ্রীকান্ত' ও দ্বিতীয় ভাগের নাম দেওয়া যেতে পারে 'শ্রীকান্ত' পরবর্ত্তী।

মোটামুটি ভাবে এই বিভাগ রচনার ক্রম অনুসারেই। কিন্তু এই ক্রম-বিকাশ এক বিশেষ অর্থেই বুঝতে হবে। প্রথম ভাগের 'বড়দিদি' 'বিন্দুর ছেলে' 'বিরাজ বৌ' প্রভৃতির সঙ্গে দ্বিতীয় ভাগের 'চরিত্রহীন' 'গৃহদাহ' 'শেষপ্রশ্ন' প্রভৃতির তুলনা করলে সহজেই বোঝা যায়, প্রথম ভাগের রচনাকে অপরিপক্ক রচনা বলা চলে না। 'বড়দিদি'র সুরেন্দ্রনাথও নিপুণ শিল্পীর রচনা। বাস্তবিক শরৎ-প্রতিভা বাঙালীর যে এতটা বিস্ময়ের সামগ্রী হয়েছে, বড় কারণ তার মনে হয় এই যে, পাঠকরা তাঁর রচনার অপরিপক্কতার সুযোগ পেয়ে তাঁকে তামাসা বা কৃপা করবার অবসর কখনো পাননি।—এই বিভাগ আমরা করতে চাচ্ছি প্রধানতঃ শরৎচন্দ্রের প্রতিপাদ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে।

এই প্রতিপাদ্য কি? অল্পকথায় বল্লে দাঁড়ায়, প্রথম ভাগে, অর্থাৎ 'বড়দিদি' 'বিরাজ বৌ' এমন কি 'পল্লী-সমাজ' প্রভৃতি গ্রন্থে, শরৎচন্দ্র নিপুণ শিল্পী বটেন কিন্তু নূতন ভাবুক নন; কিন্তু দ্বিতীয় ভাগে, অর্থাৎ 'চরিত্রহীন' 'গৃহদাহ' 'শেষ-প্রশ্ন' প্রভৃতি গ্রন্থে, তিনি নিপুণ শিল্পীও বটেন, নূতন ভাবুকও বটেন।

'নূতন ভাবুক' কথাটা হয়ত একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। এ-কালের বাংলা সাহিত্যের সূচনা মধুসূদন থেকে, কিন্তু এ-কালের বাঙালী সমাজ ও বাংলা সাহিত্যের স্বাভাবিক যোগের সূচনা বঙ্কিমচন্দ্র

থেকেই। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কল্পনার ইন্দ্রজালে তাঁর দেশবাসীকে অভিভূতই করেন নাই, দেশের যে জীবন-ধারা তার ভিতরকার মনোহারিত্বেরও অনেকখানি সন্ধান তিনি তাঁদের দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে "আমরা আমাদের ঘরের মেয়েকে সূর্য্যমুখী কমলমণি রূপে দেখিলাম...আমাদের প্রতিদিনের ক্ষুদ্র জীবনের উপরে একটি মহিম-রশ্মি নিপতিত হইল।" রবীন্দ্রনাথ নিজেও বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট এই নব-বাঙালীত্বের সৌষ্ঠববিধানে ব্রতী হলেন। যৌবনে তিনি চেয়েছিলেন—

মুখ-হাসি আরো হবে উজ্জ্বল
সুন্দর হবে নয়নের জল
স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল
আরো আপনার হবে
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে
আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ পরে
শিশিরের মত রবে...

তাঁর সে-কামনা বিফলে যায় নাই। তাঁর গল্পগুচ্ছের সংখ্যাতীত নায়ক-নায়িকা আর উপন্যাসের আশা-বিনোদিনী-মহেন্দ্র, কমলা-রমেশ, ললিতা-সুচরিতা-বিনয়-অনন্দময়ী প্রভৃতির ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সুখ-দুঃখের উজ্জ্বল আলেখ্যে এ-কালের বাঙালীর গৃহ ও জীবন সুন্দর ও মধুময় হয়েছে। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অংশে এই ধারারই অনুসরণ করেছেন। সে-অনুসরণে তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। বাঙালী জীবনের মাধুর্য্য আরো কাছে থেকে দেখে আরো চমকপ্রদ করে তিনি

অঙ্কিত করেছেন। কিন্তু তবু এ অনুসরণই। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'পল্লী-সমাজ'ও এই শ্রেণীর অন্তর্গত করে আমরা ভাবতে পারছি এই জন্য যে, এতে পল্লীসমাজের যত নিন্দাই থাকুক, তবু তা খুব বেশী নিন্দা নয়, কেননা এখানে তাঁর লক্ষ্য যে-দিকে সে হচ্ছে এই পল্লীসমাজ-কেই একটু-খানি মেজে-ঘষে নেওয়া, তার বেশী নয়; সমাজ ও পারিবারিক গঠন ইত্যাদি বিষয়ে দেশের যে প্রচলিত আদর্শ, বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের ভিতরে যে সাধারণ সম্পর্ক, সে-সব কোনো নূতন দৃষ্টি দিয়ে দেখ্‌বার কথা তিনি ভাবেন নাই। দ্বিতীয় অংশে শরৎচন্দ্রের মনোভাব কিন্তু এইই নয়। দেশের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে নূতন সমস্যা সম্প্রতি তিনি বিশেষভাবে ভাবতে শুরু করেছেন, কিন্তু 'শ্রীকান্তে'র পর থেকে, অথবা 'শ্রীকান্তে'র সময় থেকে ( কেননা 'শ্রীকান্তে' ঘরের মায়া নয়, বাহিরের তাগিদই শরৎচন্দ্রকে বেশী করে লেগেছে ) যে কয়েকখানি বড় উপন্যাস তিনি লিখেছেন, তার প্রায় প্রত্যেকটিতে যে-জীবনের ছবি এঁকেছেন, সে-জীবন আমাদের একান্ত পরিচিতই নয়। রাজলক্ষ্মী অভয়া কিরণময়ী সুরেশ অচলা যে পরমদুঃখময় সুবিপুল জীবন নিয়ে আমাদের হৃদয় ও মনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে দাঁড়ায় তা একালের বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন নয় বটে কিন্তু অনেকখানি নূতন।

এই দ্বিতীয় অংশের পরিণতিস্বরূপ ধরা যেতে পারে 'শেষ-প্রশ্ন'কে। এই 'শেষপ্রশ্ন' নানা বাদানুবাদের কারণ হয়েছে। তার মধ্যে সব চাইতে কড়া অভিযোগ শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে হয়ত এই যে, ওটি নিতান্তই প্রশ্ন, তাও খুব একালের নয়—কিছুদিন আগেকার Rationalism. বলা বাহুল্য, এ অন্যায় অভিযোগ। Rationalism কিছুদিন আগে ইয়োরোপের চিত্ত আন্দোলিত করেছিল বলেই আজ তা পুরাতন অর্থাৎ

অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, এ যদি সত্য হয়, তবে অত্যন্ত পুরাতন Mysticism ও Atheism নূতন করে এ-কালের মানুষের মনে প্রেরণা যোগাতে পারত না। গোটে বলেছেন—যাতে জীবনের মর্য্যাদা বাড়ে, তাইই সত্য। এই দৃষ্টিভূমি থেকে দেখলে বোঝা যাবে, Rationalism-এর আশ্রয় আজ যদি শরৎচন্দ্র নিয়ে থাকেন, তবে তাঁর চারপাশের জীবনের প্রয়োজনেই নিয়েছেন। তাছাড়া ‘শেষপ্রশ্নে’র কমলের চরিত্র বেশ একটু সৃষ্টিও বটে। আমার ত মনে হয়, রমঁ্যা রলঁ্যার The Soul Enchanted উপন্যাসধারার মতো ‘শেষপ্রশ্ন’ও এক উপন্যাসধারার সূচনা, কেননা কমলের চরিত্রের পূর্ণবিকাশের জন্য আরো বহু অবস্থায় তাকে দেখানো দরকার। আর কমলকে শরৎচন্দ্র একটি চরিত্র হিসাবে দাঁড় করতে চান বলে মনে হয়—যেমন রলঁ্যা Annette-কে দাঁড় করিয়েছেন।

কিন্তু শরৎ-সাহিত্য যে-ভাবে ভাগ করে আমরা দেখতে চাচ্ছি, তাতে দেখবার মতো অনেক কিছু পেলেও শরৎপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির সন্ধান যে এর সাহায্যে আমাদের লাভ হবে না তা নিঃসন্দেহ, কেননা চিন্তানায়ক-শরৎচন্দ্রের মর্য্যাদা যতই থাকুক তার চাইতে অনেক বেশী মর্য্যাদা শিল্পী-শরৎচন্দ্রের। তবে শিল্পী-শরৎচন্দ্রের মাহাত্ম্য-নিরূপণের পথে বিঘ্নও কম নয়।

প্রথমতঃ, হুবহু ছবি আঁকবার দিকে প্রবণতা তাঁর যথেষ্ট। তাতে বিস্ময়কর অনেক-কিছুর সমাবেশ সহজেই ঘটতে পারে, কিন্তু চিত্র শেষ পর্য্যন্ত তেমন অর্থপূর্ণ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, বাঙালী জীবনে গ্রাম্যতা এখনও কম নয় ; এই হুবহু-ছবি আঁকার প্রবৃত্তির ফলে গ্রাম্যতাও অনেক সময়ে এতখানি আঁকা হয়ে যায় যে তাতে পাঠকের সৌন্দর্য্যবোধ যথেষ্ট পীড়িত হয়। কিন্তু গোলাপ যেমন কাঁটাগাছে জন্মে তেমনি

এত অসম্পূর্ণতার ভিতরেও শরৎপ্রতিভা জীবনের পরমাশ্চর্য্য শিল্প-রূপ দান করতে সক্ষম হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের এই শিল্প-প্রতিভার একটি বিশেষ লক্ষণও আছে। পূর্ণাঙ্গ চরিত্র-সৃষ্টি বলতে যা বোঝায়, শরৎ-প্রতিভার প্রবণতা সেদিকে তেমন নয়; এর প্রবণতা জীবনের এক একটি মুহূর্ত্ত, এক একটি ঘটনা-সংস্থান—এই সবের অপরূপত্বের দিকেই। এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে একই সঙ্গে তাঁর মিল ও অমিল দেখিতে পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথও এম্‌নিভাবে অপরূপ মুহূর্ত্তের শিল্পী, কিন্তু সে-মুহূর্ত্ত বিশেষভাবে তাঁর নিজের ভাব-মুহূর্ত্ত। শরৎচন্দ্রের লেখনী-স্পর্শে যে-মুহূর্ত্ত রূপায়িত হয়ে ওঠে, সেটি তাঁর নিজের ভাব-মুহূর্ত্ত যেন তেমন নয়, সেটি তাঁর সাম্‌নে উদ্‌ঘাটিত মানুষের জীবনের মুহূর্ত্ত। সেই মুহূর্ত্তের জন্য শরৎচন্দ্রের নিজের ব্যক্তিত্ব যেন একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়—শুধু জলজ্যান্ত হয়ে ওঠে সেই মুহূর্ত্তের ঘটনাসংস্থানের সত্য ও পাঠকের অনুভব-শক্তি। এর দৃষ্টান্ত শরৎচন্দ্রের প্রায় সব বয়সের গ্রন্থেই বিদ্যমান, কিন্তু এর শ্রেষ্ঠতম বিকাশ লাভ হয়েছে মনে হয় 'গৃহদাহে'।

আমরা বলেছি, চরিত্র-সৃষ্টি তেমন নয় বরং মানুষের জীবনের এক একটি মুহূর্ত্তের ঘটনা- সংস্থানের অপরূপত্ব অঙ্কিত করবার দিকেই শরৎ-প্রতিভার প্রবণতা। তাঁর সাহিত্যিক creed ( বিশ্বাস ) থেকে এ-কথার সমর্থন পাওয়া যাবে। তাঁর 'শ্রীকান্ত' নিজেকে বলছেন—"মানুষের অন্তর জিনিষটা যে অনন্ত···তোমার কোটি জন্মের অসংখ্য অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে এবং হঠাৎ জাগ্রত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন তোমার লেখাপড়া তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞানভাণ্ডারটুকু এক মুহূর্ত্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে,এ-কথাটি কি একটিবারও মনে পড়ে না?" তাঁর এই মতবাদ তাঁর

সৃষ্টির উপরে সময় সময় জবরদস্তি যে না করেছে তা নয়, কেননা চরিত্র-সৃষ্টি সাহিত্যের একটি নিত্য-প্রয়োজন। সাহিত্যিকের ভাব যেখানে কোনো ব্যক্তিত্বে রূপ ধরে ওঠে নাই সেখানে তা যেন সত্যকার জীবনে সঞ্জীবিত হয় নাই। শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিদের সম্বন্ধেও এ-কথা খাটে, কেননা তাঁরা নিজেদেরই রূপায়িত করে তোলেন। কিন্তু নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিত্ব-বিকাশের চেষ্টা সোজাসুজি না করলেও, এমন কি তার বিরোধিতা করলেও, ব্যক্তিত্বের সত্যকার বিকাশ শরৎ-সাহিত্যে দুর্লভ হয় নাই এই কারণে যে, এই creed-এর চাইতে তাঁর ভিতরে প্রবলতর হচ্ছে তাঁর শিল্প-প্রতিভা, আর সেই প্রতিভার সাহায্যে মুহূর্ত্তের ঘটনা-সংস্থানের যে অপূর্ব্ব রূপ তিনি অঙ্কিত করেছেন সেই সমস্তের প্রভায় তাঁর কয়েকটী নায়ক-নায়িকা—বিশেষতঃ নায়িকা—সুমহৎ ব্যক্তিত্ব-গৌরব লাভ করেছে। 'গৃহদাহে'র কথা বলেছি। সেই গ্রন্থখানির বিস্তৃত আলোচনা করলে দেখা যাবে, শরৎচন্দ্রের creed সেখানে নিষ্ক্রিয় নয়; কিন্তু তার চাইতে অনেক বড় ব্যাপার হয়ে উঠেছে নিপুণভাবে জীবনের ছবি আঁকা, আর তারই ফলে অচলা হয়ে দাঁড়িয়েছে এক আশ্চর্য্য tragic চরিত্র। অদৃষ্টের কত পরিহাস, নারী-চিত্তের কত বেদনা তাতে প্রমূর্ত্ত! টলষ্টয়ের Anna Karenina-র সঙ্গে এর তুলনা চলে, তবে টলষ্টয়ের রেখাপাত স্পষ্টতর, পটভূমিকা বৃহত্তর।

বাংলার এই পরমজনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের বিরুদ্ধে অভিযোগও কম নেই—নানা পতিত ও পতিতার জীবনালেখ্য অঙ্কিত করে দেশে দুর্নীতির প্রশ্রয় তিনি দিয়েছেন, অনেক তরুণ-তরুণীর বুদ্ধি বিকৃত করেছেন, ইত্যাদি। এই অভিযোগের সম্পূর্ণ বিপরীতটিই যে আসলে সত্য সে-কথা বুঝতে হয়ত খুব বেশীদিন আমাদের লাগ্‌বে না।

বাস্তবিক এই ঔপন্যাসিক জীবনের কথা বড় গভীর করে ভাবেন। Art for art's sake-বাদী অতি-আধুনিকরা তাঁকে গুরুস্থানীয়ও ভাব্‌তে পারেন, কিন্তু Art for art's sake দলের সাহিত্যিকও তিনি নন। মানুষের জীবনের প্রতি এক অপরিসীম মর্য্যাদা-বোধ, হয়ত ভগবানের প্রতি ভক্তের যে মর্য্যাদা-বোধ তেমনি মর্য্যাদা-বোধ, রয়েছে এই শিল্পীর শিল্প-প্রেরণার মূলে। শরৎ-প্রতিভা বিংশ শতাব্দীতে বিকশিত হয়েছে সত্য, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মান্দোলনবিক্ষুব্ধ বাংলারই তিনি সন্তান—হয়ত সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান।

১৩৩৯

# বঙ্কিম-প্রতিভা

বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচকদের তিনটি বড় দলে ভাগ করে' দেখা যেতে পারে। প্রথম দল বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে দেখেছেন ভারতীয় অথবা এশিয়ার আধ্যাত্মিক আদর্শের এক সুন্দর পরিণতি ; দ্বিতীয় দল তাঁর ভিতরে দেখেছেন সত্যকার সাহিত্যিক প্রতিভা, অর্থাৎ ভাষার পর্য্যাপ্ত প্রকাশ-সামর্থ্য ও মানবজীবনের সত্যোদ্‌ঘাটনের দুর্লভ শক্তি ; আর তৃতীয় দল তাঁকে ভাবেন খেয়ালী, কিছু রোমাঞ্চকর, আখ্যায়িকা-স্রষ্টা। তৃতীয় দল তাঁদের মতামত তেমন পূর্ণাঙ্গ করে' ব্যক্ত করার তাগিদ এখনো অনুভব করেন নাই, তাই প্রথম দুই দলের মতই বিচার্য্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে যাঁরা ভারতীয় অথবা এশিয়ার আধ্যাত্মিক আদর্শের সুপ্রকাশ দেখেছেন তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় শশাঙ্কমোহন সেন অগ্রগণ্য, কেননা তিনি এই আধ্যাত্মিকতা বল্‌তে মানুষের অন্তরাত্মার এক বিশেষ বিকাশ বুঝেছেন ; সাধারণতঃ আমাদের দেশের আধ্যাত্মিকতা-বাদীরা যেমন প্রচ্ছন্ন অথবা অপ্রচ্ছন্ন দাম্ভিক সেই সাহিত্যিকজন-অশোভন রূঢ়তার দ্বারা তিনি কখনো আক্রান্ত হন নাই।

কিন্তু মনে হয় যথেষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন ও দৃষ্টিসম্পন্ন হলেও কতকটা সমসাময়িক কালের প্রভাবের বশীভূত হয়েই তিনি বঙ্কিম-সাহিত্য সম্পর্কে এই ধরণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কালে এমন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ছিলেন, হিন্দু-সমাজের জাগরণ নামে যে-ব্যাপারটির জন্য দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করে' থাকেন তার সঙ্গে তাঁর সংস্রব এত বেশী যে তাঁর সম্বন্ধে এরকম ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক।—আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ম্মজীবন বল্‌তে কি বোঝায় সে-সম্বন্ধে একাধিক সংজ্ঞা বা বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের এই সংজ্ঞাটিও সুন্দর ;—তিনি বলেছেন, সমুদয় বৃত্তির

ঈশ্বরমুখী হওয়ার নাম ধর্ম্ম। কিন্তু ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে—অথবা কৃষ্ণচরিত্র ও সাম্য-প্রণেতা বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরেও—এই 'সমুদয় বৃত্তির ঈশ্বরমুখী হওয়া'র শান্তি বাস্তবিকই কি আমরা অনুভব করি? তার চাইতে দুঃখবোধ, নৈরাশ্য ও অশান্তি—প্রকৃতির নির্ম্মমতার জন্য দুঃখ, মানুষের অক্ষমতার জন্য নৈরাশ্য ও তাঁর নিজের প্রকৃতির ভিতরকার কি-এক অশান্তিবোধ—এই সবই কি তাঁর উপন্যাসগুলোতে আমরা বেশী করে' অনুভব করি না? অনেক সাধুসন্ন্যাসীর কথা, তাঁদের পরোপকার-ব্রতের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আছে বটে—মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র এসব কথা শ্রদ্ধার সঙ্গেই ভাবতেন—কিন্তু সাহিত্যিকের যে-চেতনা তাঁর সৃষ্টিতে ব্যক্ত হয় সেই চেতনায় এই আধ্যাত্মিকতার শান্তি ত পৌঁছায় নাই!

তাই দ্বিতীয় দলের কথাই বেশী ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় সাহিত্যিক বৈভবও কম নয়, সাহিত্যামোদীদের দৃষ্টিও তাই এঁদের মতামতের দিকেই সহজে আকৃষ্ট হয়।

কিন্তু মনে হয় এঁরাও কিছু বিভ্রান্ত হয়েছেন সমসাময়িক কালের প্রভাবে। বিদ্যাভ্যাসের সময়ে ইংরেজি সাহিত্যের চর্চ্চা আমরা করি, ইংরেজি সাহিত্যের সমালোচকদের নানা তত্ত্ব আমাদের রাগ-দ্বেষের বিষয় হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক কৃতিত্ব বিচার করতে গিয়ে এই দ্বিতীয় দল ইংরেজি বা ইয়োরোপীয় সাহিত্য-প্রীতির পরিচয়ই দিয়েছেন বেশী, বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে যে বাস্তবিকই জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে চেয়েছেন তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রকে এঁরা বলেছেন দুর্ল্ভ রূপাঙ্কন ক্ষমতার অধিকারী—ইংরেজীতে যাকে বলা হয় objective art-এর শিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্র সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাই রূপাঙ্কনের ক্ষমতা যে তাঁর আছে তাতে সন্দেহ

নাই। কিন্তু সাহিত্যিক রূপাঙ্কন বলতে আরো কিছু বোঝায়। সুবিখ্যাত শিল্পী চসারকেও কোনো কোনো সাহিত্য-সমঝদার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রূপস্রষ্টা বলেন নাই এই ভাবনা থেকে যে (তাঁদের ধারণায়) মানবের অন্তর্জ্জীবনে চসারের দৃষ্টি যথেষ্ট গভীর নয়। অপর পক্ষে টলষ্টয়ের রচনায় প্রচলিত সাহিত্যিক সৌষ্ঠব লক্ষ্যযোগ্য না হলেও তাঁকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-প্রতিভার অধিকারী বলা হয় এই জন্য যে মানবজীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় গভীর ও ব্যাপক। এই জিজ্ঞাসার দৃষ্টি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে চাইলে খুশী হবার অনেক কিছু তাঁর ভিতরে আমরা পাই সন্দেহ নাই, কিন্তু তাতে তো পরিতোষ লাভ হয় না। ধরা যাক তাঁর বিষবৃক্ষ। তাতে যে সব চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন সহজেই সে-সব মনোজ্ঞ। কিন্তু তারা বড় বেশী প্রাদেশিক। অবশ্য প্রাদেশিকতা মাত্রই সাহিত্যে নিন্দনীয় নয়, বরং অনেক স্থলে প্রশংসনীয়, কেননা পরিবেষ্টনের ভূমিকায়ই রূপসৃষ্টি সম্ভবপর। কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য একই সঙ্গে প্রাদেশিক ও সার্ব্বভৌমিক। টলষ্টয়ের নায়ক নায়িকাও কম প্রাদেশিক নয়, কিন্তু সেই প্রদেশিকতার বেশে যে তারা সার্ব্বভৌমিক একথা বুঝতে এতটুকু বেগ পেতে হয় না। মনে হয় বিষবৃক্ষের ক্ষুদ্র বৃহৎ উজ্জল-মহৎ সমস্ত চরিত্রই নিতান্ত অল্প পরিসরে উজ্জ্বল বা মহৎ, একটু বিস্তীর্ণ পরিবেশে তাদের দাঁড় করালেই তারা যেন হয়ে পড়ে অনেকখানি গৌরবহীন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক কমলমণি চরিত্র। বাঙালী মাত্রেরই অন্তরের অভিনন্দন তার উদ্দেশে, কিন্তু অন্তর্নিহিত যে রুচি ও বুদ্ধিবৃত্তির ফলে নায়ক-নায়িকার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয় বাস্তবিকই তার সেটি লাভ হয় নাই।

তেম্‌নি ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরের প্রতাপ। প্রতাপ আমাদের পরম প্রিয়, পরম শ্রদ্ধেয়। তাকে যে মহৎ সম্ভাবনাপূর্ণ করে' কবি এঁকেছেন তা বুঝতে দেরী হয় না। কিন্তু লুণ্ঠন যুদ্ধ প্রভৃতি ব্যাপারের

সঙ্গে তাকে সংশ্লিষ্ট করে' তার ব্যক্তিত্বকে যে ভাবে বিকশিত করতে পারলে এই সব চেষ্টা অর্থপূর্ণ হতো সেটি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে সম্ভবপর হয় নাই। অর্থাৎ প্রতাপ কবির খানিকটা সৌন্দর্য্যময় উপলব্ধি, কিন্তু সত্যকার চরিত্র-সৃষ্টি বা জীবন-সৃষ্টি নয়।

সত্যকার রূপসৃষ্টি তেমন নয়, বরং কিছু কিছু সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে মনে হয়। রূপ-সৃষ্টিও তাঁর সাহিত্যে আছে, যেমন, নবকুমার, মতিবিবি, জেবুন্নিসা, সীতারাম ইত্যাদি। * কিন্তু একটুখানি ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, এসব ক্ষেত্রে সত্যকার রূপসৃষ্টির চাইতে ideaর ( চিন্তার ) সৌন্দর্য্যময় উপলব্ধিই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। সেই ideaও তিনি অনেক জায়গায় পূর্ণাঙ্গ হতে দেন নাই দেশের ও সমাজের কল্যাণ সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত ধারণার ফলে।

অদ্ভুত কথাটা ইচ্ছা করেই ব্যবহার করেছি। বৃহত্তর দেশ (সুতরাং পূর্ণ সত্য ) তাঁর চিন্তা-ভাবনার বিষয় তেমন হতে পারে নাই, হিন্দু-সমাজের উন্নতির জন্য আগ্রহের অস্বস্তিই তাঁর ভিতরে হয়েছে বেশী লক্ষ্যযোগ্য। বলা বাহুল্য তাতে হিন্দু-সমাজের প্রকৃত উন্নতিও সম্ভবপর নয়, কেননা হিন্দু-সমাজ একক কিছু নয়, অনেক কিছুর সঙ্গে নানা ভাবে সম্পর্কিত।

প্রতিভা ফরমাসে গড়া যায় না, ও প্রকৃতির দান— কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ করতে হয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে সেই প্রতিভার স্ফুরণ যতটুকু হয়েছে সেইটুকু নিয়েই আমাদের আনন্দ। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক মর্য্যাদা বিস্মৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তার পরিমাণ উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের মূল্য ও মর্য্যাদা নিরূপণও সেই কারণে কতকটা অসম্ভব।

মুসলিম সাহিত্য-সমাজের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। চৈত্র, ১৩৩৯

---

* রোহিণী-হত্যার অপরাধে "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র সাহিত্যিক মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে। গোবিন্দলাল চরিত্র হয়ে পড়েছে অনেকখানি প্রাদেশিক।

# "আবদুল্লাহ্"

১৯১৮ সালে কঠিন অস্ত্রোপচার-ভোগের পরে কাজি ইমদাদুল হক সাহেবকে দীর্ঘ হাসপাতাল বাস স্বীকার করতে হয়। তাঁর "আবদুল্লাহ্" সেই হাসপাতাল-বাসকালে রচিত। এর দুই বৎসর পরে "মোস্‌লেম ভারতে" ধারাবাহিকভাবে এটি প্রকাশিত হ'তে থাকে। প্রায় দেড় বৎসর কাল স্থায়ী "মোসলেম ভারতে" 'আবদুল্লাহ্' যতখানি প্রকাশ করা হয়েছিল বোধ হয় ততখানি লিখেই ইমদাদুল হক সাহেব পাণ্ডু-লিপি "মোসলেম ভারত"-সম্পাদকের হস্তে অর্পণ করেছিলেন। এর পরে তাঁর স্বাস্থ্য ক্রমাগত ভেঙে পড়তে থাকে, তাই এই বইখানি তিনি লিখে শেষ করে যেতে পারেননি। এর ৪১ পরিচ্ছেদের ৩০ পরিচ্ছেদ তাঁর নিজের রচনা। বাকি অংশটুকুর খসড়া তিনি রেখে গিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরে সেটুকুকে গল্পের আকৃতি দেবার ভার পড়ে আনোয়ারুল কাদীর সাহেবের উপরে। ৩১ পরিচ্ছেদ থেকে ৪১ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত আবদুল্লাহ্‌র ভাষা আনোয়ারুল কাদীর সাহেবের বলেই মনে হয়। তবে শুনেছি আরো দুই একজন মুসলমান সাহিত্যিককে নাকি পাণ্ডুলিপি-খানি দেখানো হয়েছিল।

রচনার প্রায় পনের বৎসর পরে আবদুল্লাহ্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই দীর্ঘকালে আমাদের ভিতরে কোনো পরিবর্ত্তন যে হয় নাই তা নয়। আশরাফ-আতরাফ সমস্যা, পর্দ্দা-সমস্যা এখনো মুসলমান সমাজে আছে; কিন্তু এ সবের উৎকটতার হ্রাস হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, মহাজন-খাতক-সমস্যা এসবও নূতন রূপ নেবার পথে দাঁড়িয়েছে। তবু বাংলাদেশের এক যুগের সমাজের এই চিত্রের

সত্যকার মর্য্যাদা এতটুকু যে হ্রাস হয়েছে তা নয়। এমন কি এই 'আবদুল্লাহ্' যে দিন বাঙালীর চোখে, বিশেষ করে মুসলমান বাঙালীর চোখে, অতীত ইতিহাসের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে সেই দিনই হয়ত বোঝা যাবে, তার জীবনের উপরে অজ্ঞানতা যে দুর্য্যোগ-রাত্রির নিবিড়তা নিয়ে জমেছিল তার অবসান হয়েছে।

বলা হয়েছে এ একখানি সমাজ-চিত্র। কিন্তু চিত্রকরের ক্ষমতা যে কত, নানা দিক দিয়ে তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। আমরা সেই সম্পর্কে দুই একটী কথা বলতে চেষ্টা করব।

প্রথমেই চোখে পড়ে বইখানিতে সমস্ত রকমের আতিশয্যের অভাব। আশরাফ-আতরাফ সমস্যা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব চিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে সহজেই সে-সব ভয়ঙ্কর হয়ে উঠ্‌তে পারত। কিন্তু উৎকটতার প্রলোভন এড়িয়ে চলবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই কাণ্ডজ্ঞান-প্রেমিকের ও কৌতূহল-রসিকের। আমি একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেব। ২৯ পরিচ্ছেদে আবদুল্লাহ্ হেড্ মাষ্টার হয়ে রসুল-পুর স্কুলে যাচ্ছেন—গরুর গাড়ীতে। পল্লীগ্রামের পথ বর্ষার অত্যাচারে ভীষণাকার হয়েছে। এক জায়গায় গাড়ী অচল হ'য়ে দাঁড়াল। পাশের এক ব্রাহ্মণের বাড়ীর পাশ দিয়ে পায়ে হেঁটে যাবার পথ ছিল। কিন্তু সে চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যাপার কি দাঁড়াল 'আবদুল্লাহ্'-কারের ভাষায় তার পরিচয় এইঃ—

…গাড়োয়ান কহিল "হুজুর, আছে এট্টা পথ ; কিন্তু সে এক ঠাহুরির বাড়ীর পর ভ্যে যাতি হয়। আপনি গে তানারে এট্টু করে বুলে দ্যাহেন যদি যাতি দেন।"

…আবদুল্লাহ্ গিয়া বৈঠকখানার বারান্দার উপর উঠিল। গৃহমধ্য হইতে শব্দ আসিল—,কে ?' আবদুল্লাহ্ কহিল,—"মশায় আমি বিদেশী, একটু মুস্কিলে পড়ে আপনার কাছে" বলিতে বলিতে ঘরে উঠিবার জন্য পা বাড়াইল।

টুপি চাপকান পরিহিত অদ্ভুত মূর্ত্তিখানি সটান ঘরের মধ্যে উঠিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া গৃহমধ্যস্থিত লোকটি সত্রাসে "হাঁ, হাঁ. করেন কি. করেন কি, বাইরে দাঁড়ান, বাইরে দাঁড়ান" বলিতে বলিতে তক্তপোষ হইতে নামিয়া পড়িলেন। আবদুল্লাহ্ অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি পা টানিয়া লইয়া বারান্দায় সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

"কি চান মশায় ?" সেই লোকটি দরজার গবরাটের উপর দাঁড়াইয়া দুই হাতে চৌকাটের বাজু দুটী ধরিয়া, একটু রুষ্ট স্বরে এই প্রশ্ন করিলেন।

আবদুল্লাহ্ যথাশক্তি বিনয়ের ভাব দেখাইয়া কহিলেন,—"মশায় আমি গরুর গাড়ী করে যাচ্ছিলাম, গ্রামের মধ্যে এসে দেখি রাস্তা এক জায়গায় ভাঙ্গা, গাড়ী চলা অসম্ভব। শুনলাম মশায়ের বাড়ীর পাশ দিয়ে একটি পথ আছে যদি দয়া করে......"

লোকটি রুখিয়া উঠিয়া কহিলেন—"হ্যাঃ, তোমার গাড়ী চলে না চলে তা আমার কি ? আমার বাড়ীর উপর দিয়ে ত আর সদর রাস্তা নয় যে, যে আস্‌বে তাকে পথ ছেড়ে দিতে হবে......"

আবদুল্লাহ্ একটু দৃঢ়স্বরে কহিল,—"মশায় বিপদে পড়ে একটা অনুরোধ করতে এসেছিলাম, তাতে আপনি চট্‌ছেন কেন ? পথ চেয়েছি বলে ত আর কেড়ে নিতে আসিনি ! সোজা বল্লেই হয়, না, দেব না !"

"ওঃ, ভারিত লবাব দেখি ! কে হে তুমি, বাড়ী বয়ে এসে লম্বা লম্বা কথা কইতে লেগেছ ?" ইত্যাদি।

গাড়োয়ানের সঙ্গে নিজে কাদায় নেমে গাড়ী চালিয়ে নেবার চেষ্টা করে' বিফল হয়ে অবশেষে অন্য গ্রাম থেকে লোক ডেকে এনে এই সঙ্কট থেকে আবদুল্লাহ্ পরিত্রাণ পেলেন। এমন ঘটনায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ যে কি বিষম ফেনিয়ে উঠ্‌তে পারে আজকালকার পাঠকদের সে কথা বলবার প্রয়োজন করে না। কিন্তু এমনি ভাবে বিপদ কাটিয়ে কাজি ইমদাদুল হকের আবদুল্লাহ্ সেই অদ্ভুত লোকটির প্রতি তাকিয়ে দেখলেন এই ভাবে :—

ব্রাহ্মণটি উঠিয়া গিয়াছিলেন ; কিছুক্ষণ পরে পান চিবাইতে চিবাইতে ডাবা হাতে আবার বাহিরে আসিয়া বসিলেন।......

যাইবার পূর্ব্বে আবদুল্লাহ্ সেই ডাবা-প্রেমিক ব্রাহ্মণটির দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ঠাকুর মশায় তাহাদের দিকেই তাকাইয়া আছেন এবং স্বস্থচিত্তে ধূমপান করিতেছেন।

এমন বহু চিত্র এই 'আবদুল্লাহ্' গ্রন্থে আছে যেখানে মুসলমান-সমাজের ক্লেদ, হিন্দু মুসলমান-সম্পর্কের ক্লেদ অশেষ দক্ষতার সঙ্গে এই চিত্রকর অনাবৃত করে ধরেছেন। কিন্তু এই সমস্ত মূঢ়তা বর্ব্বরতা ও বীভৎসতার উপরে ফুটে রয়েছে তাঁর হাস্যচটুল কিন্তু প্রীতিময় দুটি চোখ।

চিত্রাঙ্কনে আবদুল্লাহ্-কারের কৃতিত্ব কতখানি প্রকাশ পেয়েছে সে সম্বন্ধে মতভেদ হতে পারে। কেউ কেউ বল্‌তে পারেন, ব্যক্তির চাইতে সমাজের দিকেই তাঁর দৃষ্টি বেশী, তাই তিনি যাঁদের আমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছেন তাঁরা ব্যক্তি তেমন নয় যেমন সমাজের বিচিত্র গতি-ভঙ্গির পরিচয়-চিহ্ন। এই মতের যথার্থতা অনেকখানি স্বীকার করা যেতে পারে, কিন্তু পূরোপূরি নয়। আবদুল্লাহ্‌র পাত্রপাত্রীরা আমাদের চার পাশের অতিপরিচিত প্রতিবেশী-প্রতিবেশিনীর দল সন্দেহ নাই ; কিন্তু এই চিত্রকরের চোখ দুটি বড় সজাগ, তাই অতি-পরিচিতদেরও তিনি মাঝে মাঝে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখেছেন যে তাতেই এঁদের অনেকের ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছে পাঠকদের কৌতূহলের সামগ্রী। অপেক্ষাকৃত অপ্রধান চরিত্রগুলির ভিতরে 'পূর্ব্বাঞ্চল নিবাসী' মৌলবী সাহেব, বরিহাটী গভর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, তারুণ্যের প্রতিমূর্ত্তি আবদুল কাদের, এম্‌নি ধরণের সৃষ্টি। অতিপরিচিত বলে এদের প্রতি অমনোযোগী হওয়া সম্ভবপর নয়।

'আবদুল্লাহ্'র প্রধান চরিত্র এই ক'জন—আবদুল্লাহ্, সৈয়দ সাহেব, মীর সাহেব, আর ডাক্তার দেবনাথ সরকার। যে বিবেচনায় আমরা আবদুল কাদেরকে অপ্রধান চরিত্র বলেছি সেই বিবেচনা থেকে ডাক্তার দেবনাথ সরকারকেও কেউ যদি অপ্রধান চরিত্র ভাবেন তবে আপত্তি না করলেও চলে। কিন্তু এই ডাক্তারের ভিতরে এমন একটি সহজ সুন্দর নব্য-বাঙালীত্ব ও মনুষ্যত্ব ফুটে উঠেছে যে সেইজন্যই মনে হয়, হয়ত ডাক্তারের ভিতরে রূপ ধরতে চেয়েছে কাজি ইমদাদুল হকের এক সুগভীর আকাঙ্ক্ষা।

আবদুল্লাহ্, সৈয়দ সাহেব, মীর সাহেব এই তিন প্রধান চরিত্রের ভিতরে প্রধানতম কে, এ নিয়ে তর্ক চল্‌তে পারে। আবদুল্লাহ্‌কে সহজেই গ্রন্থের প্রধান ব্যক্তি ভাবা যেতে পারে, কেননা গ্রন্থের সর্ব্বত্র তাঁর সাক্ষাৎ পাই, আর বহু বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি জয়ী হতে পেরেছেন। তাঁর চরিত্রে তেজের চাইতে বুদ্ধি ও ভব্যতার অংশই বেশী, তবু যে-সাফল্য তিনি অর্জ্জন করেছেন তাকে বীর্য্যবন্তের সাফল্যই বলা যায়। কিন্তু যখন ভাবা যায়, রক্ষণশীল সৈয়দসাহেবের প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব, তাঁর চারপাশের জগতের উপরে তাঁর প্রভাব, আর সমাজে অপ্রিয় কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও বিচক্ষণ মীর সাহেবের অনাড়ম্বর কিন্তু সুনিশ্চিত সংস্কার-প্রয়াস ও তাতে অনেকখানি সাফল্য, তখন মনে হয় এই দুই ব্যক্তি অথবা দুই শক্তি হচ্ছে আবদুল্লাহ্-কারের তুলিকার প্রধান বিষয়,—আবদুল্লাহ্, আবদুল কাদের, আবদুল খালেক, রাবিয়া, হালিমা, প্রমুখ মুস্‌লিম নবীন নবীনা হচ্ছেন বাংলার মুস্‌লিমসমাজের এই দুই বিরুদ্ধশক্তির অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষ-জাত স্ফুলিঙ্গ। এই স্ফুলিঙ্গই অবশ্য ভবিষ্যতের অচঞ্চল আলোকের পূর্ব্বাভাস।

পুরুষ চরিত্রের মতো নারী-চরিত্র তেমন প্রস্ফুট করে আবদুল্লাহ্-

কার আমাদের সামনে ধরেন নাই, অথবা ধরতে পারেন নাই। এর প্রধান কারণ মনে হয়, বর্ত্তমান মুসলমান-সমাজে নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা। তবু আবদুল্লাহ্‌র মাতা, হালিমা ও রাবেয়ার অন্তরের যে মাধুর্য্যটুকুর সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচিত করিয়েছেন তা মনোরম। এই মুস্‌লিম অন্তঃপুরিকাদের দিকে চাইলেই ভাল করে' বোঝা যায়, বাংলার হিন্দু ও মুসলমান বাহ্যত যতই বিভিন্ন হোক বাস্তবিক পক্ষে তাদের বিভিন্নতা কত নগণ্য—নাই বল্লে হয়ত অত্যুক্তি হয় না।

আবদুল্লাহ্‌র মতো একখানি সমাজ-চিত্রে বহু প্রাচীন হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে লেখকের কি মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা জানতে স্বভাবতঃই কৌতূহল হয়। কিন্তু এই লেখকের যে প্রধান কর্ম্ম, অথবা ধর্ম্ম, চিত্রাঙ্কন এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম তাঁতে ঘটে নাই। হিন্দু ও মুসলমানের কার অপরাধ কতখানি এ চুলচেরা ভাগে তাঁর রুচি নাই, তাদের ভবিষ্যৎ কেমন সে সম্বন্ধেও বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তা তাঁর নাই। এক্ষেত্রেও তিনি কাণ্ডজ্ঞানপ্রেমিক ও হৃদয়বান্‌ ব্যক্তি। হেড্‌মাষ্টার হয়ে যাবার প্রাক্কালে তাঁর আবদুল্লাহ্‌ সমাগত ছাত্রদের এই আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছেন—"আশীর্ব্বাদ করি তোমরা মানুষ হও, প্রকৃত মানুষ হও—যে মানুষ হলে পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করতে ভুলে যায়, হিন্দু মুসলমানকে, মুসলমান হিন্দুকে আপনার জন বলে' মনে কর্ত্তে পারে··· ।"

আবদুল্লাহ্‌র ভাষা সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। মুস্‌লিম বাঙালীরা সদাসর্ব্বদা যে-সব শব্দ ব্যবহার করেন অথচ হিন্দু বাঙালীরা সে-সব শব্দের ব্যবহার করেন না বাঙালা সাহিত্যে সে-সবের প্রয়োগ কি ধরণের হবে এ-নিয়ে বেশ এক ছোটখাটো সমস্যার সৃষ্টি

হয়েছে। কিন্তু এমন একটি সমস্যা যে উঠেছে এ আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের দূরদৃষ্টি ও কাণ্ডজ্ঞানের কিঞ্চিৎ অভাবেরই পরিচায়ক। কোনো ভাষা মাতৃভাষারূপে লাভ করা মানুষের জন্মগত অধিকার, কিন্তু সেই ভাষায় সাহিত্য রচনা করা সাধনা-সাপেক্ষ. সেই সাধনার দ্বারা সাহিত্যিক নিজেই ভাল বুঝতে পারেন তাঁর শব্দ-সম্পদ কি ধরণের হওয়া উচিত—চিত্রের কোন্ রূপ ফোটাবার জন্য কোন্ কোন্ রেখা ও রঙের তাঁর প্রয়োজন। এই ক্ষমতার যেখানে অভাব সেখানে ভাষা বা সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো সমস্যাই ওঠে না। চিত্রের স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিকত্বে ইমদাদুল হকের ক্রটি ছিল না। সর্ব্বোপরি তিনি বাংলার সন্তান তাই তাঁর রচনা সহজেই হয়ে উঠেছে সাহিত্য ও খাঁটি বাংলা ভাষা—যে জীবনের চিত্র তিনি ফুটিয়ে তুল্‌তে চেয়েছেন তার জন্য প্রয়োজনীয় অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার সত্ত্বেও তা অকৃত্রিম বাংলা ভাষা ভিন্ন আর কিছু নয়।—বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশের অবকাশ এখনো প্রচুর, তাই কোন্ কোন্ অপরিচিত পথে পদচারণা করে' সাহিত্যিকরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করবেন সে-সবের আবিষ্কার সম্ভবপর কেবল তাঁদেরই ঐকান্তিক সাধনার দ্বারা।

আনোয়ারুল কাদীর সাহেব আবদুল্লাহ্‌র শেষ কয়েক পরিচ্ছেদ লিখেছেন বলা হয়েছে। সে-সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলে আমার এই আলোচনা শেষ করছি। কাজি ইমদাদুলহক প্রধানতঃ চিত্রকর, আর আনোয়ারুল কাদীর প্রধানতঃ মনস্তাত্ত্বিক। তাই দুজনের রচনারীতির পার্থক্য সহজেই প্রস্ফুট হয়েছে। তবে দুটি পরিচ্ছেদে আনোয়ারুল কাদীর সাহেবের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে বেশ। সেই দুটি পরিচ্ছেদের একটি সালেহার মৃত্যু-বর্ণনা, অপরটি মীর সাহেবের অন্তিমকালের বর্ণনা। ইমদাদুলহক সাহেবের আঁকা সালেহা যেন প্রাণলেশবর্জ্জিত,

দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ পিতার বিচারহীন মতবাদের প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু এই আচার-অনুষ্ঠানের স্তবকের ভিতরেও আনোয়ারুল কাদীর সাহেব একটি ক্ষীণ হৃৎস্পন্দন অনুভব করেছেন, তারই সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লাহ্‌র কর্ম্মবহুল পরিশ্রান্ত জীবন ঈষৎ প্রেমসুধাস্পর্শে ক্ষণকালের জন্য একটু নূতন রকমের করে' তুলেছেন। সমাজের নিদারুণ বিরুদ্ধতায় সবল ও বিচক্ষণ মীরসাহেবও শেষে কেমন ভেঙে পড়েছেন সে চিত্রটিও তিনি মর্ম্মস্পর্শী করে আঁকতে পেরেছেন। কিন্তু সৈয়দ সাহেবের নিষ্ঠা ও আড়ম্বরপ্রিয়তার প্রতি একটু সদয় বা সশ্রদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' তিনি যে সফল-প্রযত্ন হতে পেরেছেন তা মনে হয় না। যতদূর বুঝেছি তাতে মনে হয় সৈয়দ সাহেবের চরিত্রে নিষ্ঠা থাকলেও সে-নিষ্ঠাকে ইমদাদুল হক সাহেব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নাই, এই নিষ্ঠার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিশেছে বিষম আত্মপরায়ণতা। ভবিষ্যৎদৃষ্টির একান্ত অভাব, ও যা আছে বা ছিল তার জন্য প্রচণ্ড মোহ, অন্যকথায় আত্মম্ভরিতা, মনে হয়, এরই উপরে সৈয়দ সাহেবের চরিত্রের ভিত্তি। তাঁর নিষ্ঠা ও আড়ম্বরপ্রিয়তা এরই আনুষঙ্গিক; তাঁর স্বভাবদত্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিও এই আত্মম্ভরিতার কুহক থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারে নাই। এই সৈয়দ-সাহেবেরা মুসলমান সমাজে বিরল নন আদৌ। এমন উৎকট আত্মম্ভরিতা মুসলমান-চরিত্রে কেন এমন প্রবল হলো তার কারণ-নির্ণয়-চেষ্টার অবকাশ এখানে নাই; কিন্তু সমাজের এই দারুণ ক্ষতস্থান কাজি ইমদাদুল হকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে এ সম্ভবপর নয়।

"মুস্‌লিম কালচার" নামে যে সুন্দর কিন্তু সাড়ম্বর 'মোগল কালচারে'র ধ্বংসাবশেষের প্রতি আজও বাংলার শিক্ষিত মুসলমানের অনুরাগের অন্ত নাই তারও প্রতি আবদুল্লাহ্-কারের মনোভাব বেশ

বুঝে দেখবার মতো। অতীত বা ভবিষ্যৎ কোনো শ্রেণীর মোহই যেন তাঁর জন্য প্রবল নয়। তিনি কাম্য জ্ঞান করেছেন বুদ্ধি-ও-সুরুচি-নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা—এইই মনে হয়।

হয়ত আবদুল্লাহ্ সম্পর্কে আনোয়ারুল কাদীর সাহেবেরও যথেষ্ট বক্তব্য আছে, আর সেসব জানতে পারলে আমরা লাভবানই হব। তবু বইখানির ভবিষ্যৎ সংস্করণে ইমদাদুল হক সাহেবের মূল খসড়াটি পরিশিষ্ট আকারে যুক্ত থাকা সমীচীন মনে করি। পরে পরে এ বইখানি আরো বহু আলোচকের আলোচনার বিষয় হবে সন্দেহ নাই, তাঁদের জন্য এমন একটি পরিশিষ্টের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হওয়াই স্বাভাবিক।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১

**সমাপ্ত**

# শুদ্ধি-পত্র

| পৃষ্ঠা | পঙ্‌ক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|
| ৫ | ৩ | তোমার | তোমরা |
| ১১ | ৬ | দিলেন | ছিলেন |
| ১৮ | ১১ | যুগে | যুগে |
| ৪৫ | ৩ | সুবুদ্ধি | সুবুদ্ধি |
| ৬০ | ২২ | এক | এই |
| ৬২ | ১৭ | অহিষ্ণুতা | অসহিষ্ণুতা |
| ৭২ | ১৪ | ধারাপৃষ্ঠে | ধরাপৃষ্ঠে |
| ৯৬ | ১৪ | কবিত্বয় | কবিত্বময় |
| ১০৫ | ২০ | সাদৃশ | সাদৃশ্য |
| ১২৬ | ১১ | cempletes | completes |
| ১২৮ | ৮ | প্রস্রণ | প্রস্রবণ |
| ১২৯ | ৪ | World | Would |

# পরিশিষ্ট

বিঃ দ্রঃ—৭৩ পৃষ্ঠার ৭ম ছত্রটি এই হবে :—তার কারণ, প্রথমতঃ তাঁর চরিত্র এমন নয় যে জাতির অন্তরের সিংহাসনে তাঁর আসন লাভ হতে পারে, দ্বিতীয়তঃ তাঁর যে পৌত্তলিকতাবিরোধী ধর্ম্ম-মীমাংসা তা—

২ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—(তিনি) একজন প্রাচ্য দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ, ভাবপ্রবণ, কিন্তু প্রভাববান্।—কথাটি মিস্ কলেটের লিখিত জীবনীতে আছে।

৮ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—হিন্দুর অসামাজিক ও বালকোচিত পৌত্তলিকতায় বিরক্ত হয়ে আর অমুসলমানদের প্রতি মুসলমান-ধর্ম্মের নির্ম্মমতায় দুঃখিত হয়ে আমি খৃষ্টধর্ম্মের সত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হই ; কিন্তু খৃষ্ট-অনুবর্ত্তীদের মধ্যে, অর্থাৎ ত্রিত্ববাদী ও একত্ববাদী এই দুই বড় দলের মধ্যে, যে-মতভেদ তা দেখে বহুদিন আমার দ্বিধা-সন্দেহে কাটে। অবশেষে শান্তি ও আনন্দের নির্দ্দেশক সেই স্বর্গীয় আচার্য্যের প্রদত্ত একত্বের ব্যাখ্যার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে।

১২ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—শঙ্করের মত এ নয় যে ব্রহ্ম ও জগৎ অভেদ, তিনি শুধু জগতের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করেন। ......অসীম থেকে সসীমের উৎপত্তি কেমন করে হয় এ প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলেন—এ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য, মায়া। আমরা জানি, শুদ্ধ সত্তা আছেন আর ব্যবহারিক জগৎ আছে, আর এই শুদ্ধ সত্তার উপরে ব্যবহারিক জগৎ নির্ভরশীল ; কিন্তু কেমন করে', সেটি আমাদের জ্ঞানের বাইরে। ...... শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলেরা ব্রহ্ম ও জগতের এই রহস্যময় সম্বন্ধের কথা স্বীকার করেন। তাঁরা জানেন যে মানবমন সর্ব্বজ্ঞ নয়। প্রাচ্যের শঙ্কর ও পশ্চিমের ব্রাড্‌লি জ্ঞানিজনসুলভ এই অজ্ঞেয়তাবাদের সমর্থক।

১৩ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—এমন কোনো মত নাই যাতে বলা হয়েছে যে জীবন স্বপ্ন, আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা অলীক। শঙ্করের বহুপরের দুই একজন শিষ্যের ভিতরে এই মতের কিছু সমর্থন পাওয়া যায়, কিন্তু এই দিকেই যে হিন্দু-চিন্তার বিশেষ প্রবণতা তা বলা যায় না।

১৪ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—পরমহংসের মহান্ প্রেমে ও বিবেকানন্দের বীর্য্যে যেমন মিলন ঘটেছে বিশ্বমানবের সমস্ত উপাস্য দেবতার, সত্যের সর্ব্ববিধ প্রকাশের, মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্কের সমস্ত কল্প-রূপের, যুগযুগান্তের ধর্ম্মভাবের ইতিহাসে এর চাইতে সজীবতর ও সতেজতর কোনো কিছু আমার চোখে পড়ে নাই। ...... কিন্তু একথা মনে করবার হেতু নাই যে এই বিরাট বৈচিত্র্য একটি বিরাট অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা মাত্র। ...... এই সুর-সামঞ্জস্যে প্রত্যেক সুরেরই বিশিষ্ট স্থান আছে। কোনো সুর-সমষ্টিকেই এই বলে নীরব করে দেওয়া চলবে না (তাতে বহুসুর পরিণত হবে একসুরে) যে, কোনো একজনের বাজানো সুর সব চাইতে ভাল। যার যা বাজাবার তা চমৎকার করে' বাজাক, কিন্তু তার সেই সুরের সঙ্গে অন্যান্য যে-সব সুরের সঙ্গতি হচ্ছে তা সে কান পেতে শুনুক। ...... এই মতে সর্ব্বপ্রকার প্রচারব্রত—তা ধর্ম্ম-বিষয়ক হোক বা কোনো জাগতিক বিষয়ক হোক—নিন্দনীয়; কেননা এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যের বুদ্ধি-বিচার নিজেদের ছাঁচে গড়া। এক্ষেত্রে সেশ্বরবাদী ও নিরীশ্বরবাদী দুইই তুল্যমূল্য—নিরীশ্বরবাদ ছদ্মবেশী সেশ্বরবাদ মাত্র।

১৫ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—স্ব-ধর্ম্মের প্রতি আমার যে-শ্রদ্ধা পর-ধর্ম্মেরও প্রতি আমার সেই শ্রদ্ধা। সেইজন্য ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ আমার চিন্তায় অসম্ভব। আমরা যেন অন্যের জন্য এই প্রার্থনা না করি—ভগবন্, আমাকে যে-আলোক তুমি দান করেছ সে-আলোক তুমি তাদের দাও; এর পরিবর্ত্তে আমাদের প্রার্থনা যেন এই হয়—ভগবন্, শ্রেষ্ঠ পরিণতির জন্য যার যে-আলোক ও যে-সত্যের প্রয়োজন তুমি সেই সব তাকে দাও।

১৫ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—মানব-সমাজের ক্রম-অভিব্যক্তির এই অবস্থায় অন্ধ ও সচেতন শক্তি দুইই সমস্ত প্রকৃতির মানুষকে একত্র করেছে "সহযোগিতার জন্য অথবা ধ্বংসের জন্য", এ সময়ে শ্রেষ্ঠতম প্রয়োজন হচ্ছে মানবের অন্তর্লোকে এই বিশ্বাসের আবির্ভাব ঘটা—প্রত্যেক ধর্ম্মেরই বেঁচে থাকবার তুল্য অধিকার আছে. আর প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য হচ্ছে তার প্রতিবেশীর ধর্ম্ম-বিশ্বাস শ্রদ্ধা করে চলা। এটিকে একটি স্বতঃসিদ্ধান্তরূপে পরিণত করা চাই।

১৭ পৃষ্ঠা—Laissez-faire (Let alone)—যে যার পথে চলুক। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই নীতির

প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই নীতির সমর্থিত ব্যক্তিত্ব-বাদ অচিরেই সমষ্টি-বাদের দ্বারা পরাভূত হয়।

২৩ পৃষ্ঠা—Unitarian—একত্ববাদী। পিতা-ঈশ্বর, পুত্র-ঈশ্বর, ও পবিত্র-আত্মা-ঈশ্বর এই ত্রিত্ববাদের পরিবর্ত্তে যাঁরা এক ঈশ্বরে (পিতা-ঈশ্বরে) বিশ্বাস করেন।

২৪ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—আমেরিকা-বাসীরা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিল কুশাসনের ফলে। ......ভারতের এই মিশ্রিত জাতি যতদিন সদয় ব্যবহার ও উদার শাসন লাভ করবে ততদিন তারা ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করবার কোনো প্রয়োজন অনুভব করবে না। ...... ঘটনাক্রমে সম্পর্ক যদি ছিন্নই হয় তবু এই দুই স্বাধীন ও খৃষ্টান দেশের মধ্যে বন্ধুভাব ও পরস্পরের কল্যাণ-সাপেক্ষ বাণিজ্য-সম্পর্ক থাকবে—ভাষা ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের সমতুল্যতা তখন এই দুই দেশের ভিতরে যোগ রক্ষা করবে।

২৫ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—(খৃষ্টান) শাস্ত্রে এ-কথা আছে, আর বুদ্ধির সাহায্যেও আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি, যে, প্রত্যেক জাতির ভিতরে যারা ঈশ্বরের ভয় রাখে ও ধর্ম্ম আচরণ করে তারা তাঁর (যীশুর) করুণা লাভ করে, তা যে-ভাবেই তারা ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করতে শিখুক।

২৬ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—নেপল্‌স্-বাসীদের দুঃখ আমারও দুঃখ বলে আমি জ্ঞান করি—তাদের শত্রু আমাদেরও শত্রু। যারা স্বাধীনতার শত্রু ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের সমর্থক তারা কখনও সফলকাম হয় নাই আর শেষ পর্য্যন্ত কখনও সফলকাম হবে না।—এইটি একটি পত্রাংশ। পত্রখানি বাকিংহাম্ সাহেবকে লেখা, তারিখ—১১ই অগাষ্ট, ১৮২১।

২৭ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—যদি আমরা বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক সভ্যতা হচ্ছে এক একটি চরম পরিণতি, এক অতুলনীয় সম্ভাবনা রূপ পরিগ্রহ করেছে তার ভিতরে, তবে এর একটি ধ্বংস হলে জগদ্-বিধানে অভাব দেখা দেবে।

২৯ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—অন্যান্য পদ্ধতির প্রতীক-উপাসনার চাইতে হিন্দু-পৌত্তলিকতা সমাজ-বিধানের সমধিক ক্ষতিকর।

৩৪ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—ইকবালের দর্শন ধর্ম্মমূলক; কিন্তু দর্শনকে তিনি ধর্ম্মের পরিচারক জ্ঞান করেন না। ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সমাজ-জীবন-সাপেক্ষ, তিনি

মনে করেন. সেই আদর্শ সমাজ-জীবনের সন্ধান তিনি পেয়েছেন হজরত মোহম্মদের পরিকল্পিত ইসলামে।

৩৫ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—মুসলিম ইতিহাসের সঙ্কটকালে মুসলমান ইসলামকে রক্ষা করে নাই, বরং ইসলাম মুসলমানকে রক্ষা করেছে।

৪০ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—ইসলামের অভ্যুদয়ের অর্থ (মানবের) ভূয়োদর্শনজাত বুদ্ধির অভ্যুদয়। ইসলামে বার্ত্তাবহন চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে সঙ্গে সঙ্গে তার (বার্ত্তাবহনের) পরিসমাপ্তিও ঘটেছে।

৪১ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—ইসলামের জাগরণের যদি সূচনা হয়ে থাকে—এর যে সূচনা হয়েছে তাতে আমার নিজের সন্দেহ নাই—তবে তুর্কীদের মতো আমাদেরও একদিন আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন জ্ঞানের মূল্য নিরূপণ করতে হবে। ...... প্রকৃত কথা এই যে ইসলাম-অবলম্বী জাতিদের মধ্যে কেবল তুর্কীই বিশ্বাসপরায়ণতার সুখনিদ্রা পরিত্যাগ করে জাগ্রতচিত্ত হয়েছে। কেবল সেইই তার বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতার দাবী জানিয়েছে; মাত্র সেইই ভাব-জগৎ থেকে 'বাস্তব জগতে' পদার্পণ করেছে যার অর্থ মানস ও নৈতিকক্ষেত্রে এক তীব্র সংগ্রাম। চলিষ্ণু ও সম্প্রসারণশীল জীবনের বিচিত্রতা এখন তার জন্য এনে দেবে নব নব পরিস্থিতি তার ফলে উন্মেষিত হবে তার নব নব দৃষ্টি, প্রয়োজন হবে প্রাচীন মতের অভিনব ব্যাখ্যা—যাঁরা আত্মিক জীবনের বিকাশের আনন্দ অনুভব করেন নাই তাঁদের জন্য সেই সব মতবাদ বিদ্বৎসমাজের নিপুণ বিচারবিশ্লেষণের বিষয় মাত্র। বোধ হয় ইংরেজ মনীষী হব্‌স্ এই সূক্ষ্ম মন্তব্যটি করছেন—একই রকমের চিন্তা ও অনুভূতির অনুবৃত্তির অর্থ চিন্তা ও অনুভূতি বিহীনতা। বর্ত্তমানে অধিকাংশ মুসলিম দেশের এই দশা। যান্ত্রিকভাবে তাঁরা প্রাচীন সম্পদের অনুবর্ত্তন করছেন কিন্তু তুর্কী রত হয়েছে নূতন সম্পদ সৃষ্টিতে।

৪২ পৃষ্ঠা—Inferiority Complex—মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষা,—নিজে ছোট এই মনোভাব। এই মনোভাবের ফলে সাধারণতঃ মানুষ অসহিষ্ণু কলহপ্রিয় ও অন্যান্য নানা ভাবে অসামাজিক হয়।

৪৭ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—ঈশ্বরগোচর ও ঈশ্বরে-স্থিত জীবনের নাম ধর্ম্ম।

অন্তর্লোক যখন অনন্তের বোধের দ্বারা নিষিক্ত তখন তা ধর্ম্ম-ভাবে অবস্থিত বলা যায়।

ধর্ম্মের সঙ্গে দর্শনের সেই পার্থক্য সহজ সরল "আমি"র সঙ্গে চিন্তাপরায়ণ "আমি"র যে পার্থক্য, সংশ্লেষণী সহজ-জ্ঞানের সঙ্গে বিচাররত বিশ্লেষণ-বুদ্ধির যে পার্থক্য। বিশ্বজগতের সামঞ্জস্য ও কল্যাণ-বোধে আমাদের স্বতঃপ্রণোদিত নির্ভরতা ও আনন্দময় আত্মসমর্পণের ফলে আমাদের ধর্ম্মভাবে অনুপ্রবেশ ঘটে। ধর্ম্মভাব মানুষকে তার নিজের সম্বন্ধে চেতনা দান করে, অনন্ত একত্বের ভিতরে সে খুঁজে পায় তার নিজের স্থান, আর এই চেতনাই পরম সম্পদ।

৪৮ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—যারা আল্লাহ্‌র বাণী শ্রবণ করে তার পর অনুসরণ করে তার শ্রেষ্ঠ অংশের, আল্লাহ্‌র পথ-প্রদর্শন লাভ করেছে তারাই, আর তারাই হচ্ছে জ্ঞানপ্রাপ্ত।

৭২ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—বিচারবুদ্ধি ও জাতীয়তার পথে আমাদের জীবন নির্ব্বাহ হোক।—বার্ণার্ড শ' বলেছেন, তাঁর Intelligent Woman's Guide to Capitalism and Socialism গ্রন্থে।

৮৬ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—চারপাশের জগতের সঙ্গে মানুষের নূতন নূতন সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রথম চেতনার নামই ধর্ম্ম-বোধ।

৮৯ পৃষ্ঠা—দিদারুল্ আলম রেঙ্গুন থেকে দু'খানি কাগজ চালাতেন। বাংলা গদ্য ও পদ্য দুয়েতেই তাঁর হাত ছিল। অসংকীর্ণ মতবাদের জন্য তাকে নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল।

১০৭ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—বৃথা ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করোনা।

১১১ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—নরক কালো।

......আরবের সমস্ত সুরভি দিয়েও এই ছোট হাতখানি সুবাসিত করা যাবে না।

১১৪ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—গোটের কাব্যে, তাঁর সারবান্ বৈচিত্র্য-বিলাসী রূপগ্রাহী ও প্রখরবুদ্ধি মনে, প্রথম স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় আধুনিকতার বহু দিক।

১১৬ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—ধর্ম্ম বিজ্ঞান ও রাজনীতি সম্পর্কিত বিষয়ে বহু সময়ে

আমি নিজের উপরে বিপদ ডেকে এনেছি, তার কারণ, ভণ্ডামি আমার পোষাত না. আর যা মনেপ্রাণে বুঝতাম তা প্রকাশ করে বলবার সাহস আমার ছিল।

১১৭ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—সাহিত্যিকজনসুলভ দুর্ব্বলতার মধ্যে ঈর্ষা তাঁতে ছিল না বল্লেই চলে ; মহত্বের শোভাবর্দ্ধক গুণাবলীর মধ্যে মহানুভবতা তাঁতে ছিল পর্য্যাপ্ত।

১১৭ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—শুধু অন্তর-সত্তার উপরে নির্ভর করে' শ্রেষ্ঠতম প্রতিভাও বেশী দূর অগ্রসর হতে পারবেন না। কিন্তু অনেক সাধুসঙ্কল্প ব্যক্তি একথা বুঝে উঠতে পারেন না, আর তার ফলে তাঁদের মৌলিকতার স্বপ্ন নিয়ে অর্দ্ধেক জীবন তাঁরা অন্ধকারে হাৎড়ে কাটান।……আমি যা করতে পেরেছি তা শুধু আমার নিজের জ্ঞানের ফলে কখনো নয়, আমার চারপাশের শত সহস্র বস্তু ও ব্যক্তি আমাকে যে-সব উপকরণ যুগিয়েছে তারও ফলে। মুর্খ ও পণ্ডিত উদার মন ও সংকীর্ণ মন. বাল্য যৌবন ও পরিণত বয়স—সবাই আমার কাছে ব্যক্ত করেছে কি তারা অনুভব করেছে চিন্তা করেছে, কেমন করে তারা জীবন নির্ব্বাহ করেছে কাজ করেছে, ও কি অভিজ্ঞতা তারা অর্জ্জন করেছে ; আমার কাজ হয়েছিল এরা যা বপন করেছে হাত বাড়িয়ে তাই সংগ্রহ করা।

১১৯ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—এই ভাবে ঈশ্বরের উপলব্ধি-চেষ্টায় যে বিপদ এই দুর্ঘটনাকে প্রায় গণ্য করা যেতে পারে সেই সম্বন্ধে সঙ্কেত ও সাবধান-বাণী বলে'।

১২১ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—তার প্রতি আমার প্রেম পরম শুদ্ধ পরম পবিত্র নয় কি ? …আমার অন্তরাত্মা কি কখনো একটি পাপচিন্তার দ্বারাও কলুষিত হয়েছে ?

১২২ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—আর আমি ? কিসের সবল আকর্ষণ আমাকে এখানে এনেছে ?

কি প্রবল ভাবেই না আন্দোলিত হচ্ছে আমার অন্তর !<br>
কি আমি চাই ? কেন হৃদয় আমার এমন উদ্বেলিত ও ব্যথিত ?<br>
হায় ফাউস্‌ট ! তোমাকে আর চেনা যায় না।

এখানে কি কোনো যাদু-বাষ্প আছে ?
আপাতভৃপ্তির কামনা নিয়ে আমি এসেছিলাম ;
কিন্তু প্রেমের স্বপ্নরসে আমি এখন নিমজ্জিত।

১২৩ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—তিনি হচ্ছেন গৌরব-যুগের একজন গ্রীক 'ধর্ম্মবোধে'র অন্তর-বেদনা যাঁর কাছে অজ্ঞাত।……জগতের বঞ্চিত দুর্ব্বল ও অত্যাচারিত-দের প্রতি প্রকৃতির মতোই তিনি উদাসীন।

১২৩ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—এই জটিল প্রকৃতির লোকদের সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি কোনো মত প্রকাশ করা অসঙ্গত।

১২৪ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—যিনি সব চাইতে অনুভূতিপ্রবণ কেবল তিনিই হতে পারেন সব চাইতে কঠিন ও নির্ব্বিকার ; কেননা তাঁর পক্ষে প্রয়োজন হয় নিজেকে বহুস্তর বর্ম্মে আবৃত করা……আর অনেক সময় এই বর্ম্ম হয় তাঁর জন্য পীড়াদায়ক।

১২৫ পৃষ্ঠা—অনুবাদ—প্রকৃতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত মানুষ নিজেকে জ্ঞান করে আর-এক পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতি বলে, তার কাজ হচ্ছে অন্তর্লোকে আর-এক চূড়ার সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে সে তার ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন করে—সমস্ত সৌষ্ঠব ও গুণপণায় সে নিজেকে করে ভূষিত, নির্ব্বাচন শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য অর্থবোধ, এ-সবের হয় তার বিশেষ প্রয়োজন, অবশেষে লাভ হয় তার শিল্প-সৃষ্টির যোগ্যতা যা তার অন্যান্য কর্ম্ম ও কীর্ত্তির পাশে লাভ করে বিশেষ মর্য্যাদার স্থান। একবার যদি এর সৃষ্টি হয়, একবার যদি এই শিল্পসৃষ্টি জগতের সামনে দাঁড়ায় মানস-সত্য রূপে, তা হলে এর লাভ হয় এক অক্ষয় প্রভাব—শ্রেষ্ঠতম প্রভাব ; কেননা বহু শক্তির সম্মিলন-ক্ষেত্রে সাত্ত্বিকভাবে এ যে নিজেকে বিকশিত করে তোলে এই জন্য জীবনে যা-কিছু শ্রেয় ও প্রেয় সে-সবই এ নিজের ভিতরে সঞ্চিত করে, আর এই ভাবে মনুষ্যদেহে (নূতন ভাবে) প্রাণসঞ্চার করে' মানুষকে করে মহত্তর, তার জীবন ও কর্ম্মের পরিধিকে করে পূর্ণাঙ্গ, আর অতীত-ও-ভবিষ্যৎ-সমন্বিত বর্ত্তমানে তাকে দান করে দেবত্ব।

১২৬ পৃষ্ঠা অনুবাদ—সাময়িক কবিতাই আদি ও অকৃত্রিমতম কবিতা।
প্রতিভার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশেষ কর্ত্তব্য—সত্যপ্রীতি।

প্রত্যেক বিষয়ে আমি এমন একটি স্থান খুঁজি যা থেকে প্রভূত বিকাশ সম্ভবপর।

১২৬ পৃষ্ঠা অনুবাদ—সৌন্দর্য্য পার্থিব আবরণে এক দিব্য বস্তু নয় বরং দিব্য আবরণে পার্থিব সত্য।

১২৮ পৃষ্ঠা—মার্গারেটের মনে সন্দেহ জেগেছে হয়ত ফাউস্ট ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন ; তার প্রশ্নের উত্তরে ফাউস্ট বলছেন :—

Who dare express Him ?
And who profess Him ?
Saying: I believe in Him !
Who, feeling, seeing,
Deny His being,
Saying: I believe Him not !
The All-upholding,
Folds and upholds He not
Thee, me, Himself ?
Arches there not the sky above us ?
Lies not beneath us firm the earth ?
And rise not, on us shining,
Friendly, the everlasting stars ?
Look I not, eye to eye, on thee,
And feel'st not, thronging
To head and heart, the force,
Still weaving its eternal secret
Invisible, visible. round thy life ?
Vast as it is, fill with what force thy heart,
And when thou in the feeling wholly blessed art,
Call it then, what thou wilt,—
Call it Bliss ! Heart ! Love ! God !
I have no name to give it !
Feeling is all in all:
The Name is sound and smoke,
Obscuring heaven's clear glow.

স্পর্দ্ধা কার তাঁকে ব্যক্ত করতে?
বলবে কে—তাঁতে বিশ্বাস রাখি!
অনুভূতি ও দৃষ্টি অব্যাহত রেখে
বলবে কে—বিশ্বাসী তাঁতে নই!
সর্ব্বংর—
ধারণ কি করছেন না তিনি তোমাকে, আমাকে, নিজেকে?
মাথার উপরে নেই কি আকাশের খিলান?
পায়ের নীচে শান্ত ধরণী?
সামনে জ্বলজ্বল-করা
বন্ধুর-মতো-চেয়ে-থাকা চিরকালের তারা?
চোখ কি আমার দেখছে না তোমাকে?
অনুভব কি করছ না তুমি, মনে প্রাণে,
তোমার জীবন ঘিরে চলেছে কি রহস্যময় শক্তির লীলা?
—কখনো দৃশ্য কখনো অদৃশ্য!
বিরাটের দ্বারা তোমার হৃদয় পূর্ণ হচ্ছে কি প্রবলভাবে!
আর যখন তুমি ভাগ্যবতী এই অনুভূতি-ধনে
তখন নাম দিয়ো এর
পরমা শান্তি, হৃদয়, প্রেম, ঈশ্বর—যা খুশী!
আমি অক্ষম এর নাম দিতে।
অনুভূতিই আমার সব।
নাম শুধু শব্দ ও কুহেলী
আকাশের প্রোজ্জ্বলতা তাতে হয় মলিন।

১২৮ পৃষ্ঠা অনুবাদ—ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে আমাদের কিইবা জ্ঞান আছে। আমাদের সংকীর্ণপরিসর ভাবনা সেই পরমপুরুষের সম্বন্ধে কতটুকুই বা ব্যক্ত করতে পারে। যদি মুসলমানের মতো শতনামে আমি তাঁকে ডাকি তবু অকথিত থাকবে বহু, আর তাঁর মহিমার কথা ভাবলে বুঝব—কিছুই বলা হয় নাই।

১২৮ পৃষ্ঠা অনুবাদ—অন্যেরা পূজা করুন তাঁকে যিনি ষাড়কে দিয়েছেন চরবার মাঠ আর মানুষকে দিয়েছেন তার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয়। কিন্তু আমি পূজারী তাঁর যিনি জগৎকে পূর্ণ করেছেন এমন প্রাণশক্তিতে যে যদি তার অযুততম অংশও সক্রিয় হয় তবে জগত তার দ্বারা এমনভাবে পূর্ণ হবে যে যুদ্ধ মড়ক বন্যা প্রভৃতির সাধ্য হবে না তার শক্তি হ্রাস করতে। আমার ঈশ্বর ইনি।

১২৮ পৃষ্ঠা অনুবাদ—আমরা সবাই গোটের শিষ্য তা আমরা জানি বা না জানি; যে-কোনো উদারচিত্ত ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে এলেই সেই অবশ্যম্ভাবী শিষ্যত্বের কথা বুঝতে পারেন।

১২৯ পৃষ্ঠা অনুবাদ—মহাকবিরা হচ্ছেন আশা ও আনন্দের প্রস্রবণ, সেই মহাকবিদের মধ্যে এমন একজন যে আছেন যিনি মানব-প্রকৃতির সর্ব্ব ক্ষেত্রের জ্ঞানে সর্ব্বাগ্রগণ্য হয়েও জাতিতে জাতিতে অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বের বহু উর্দ্ধে নিজের চিত্ত স্থাপন করতে পেরেছেন, এ এক মহা সৌভাগ্য বলে' আমি জ্ঞান করি।

১২৯ পৃষ্ঠা অনুবাদ—জাতীয় সাহিত্য এখন বরং এক অর্থহীন কথা। বিশ্ব-সাহিত্যের যুগ আসন্ন হয়েছে আর প্রত্যেকেরই উচিত একে এগিয়ে আনা।

১২৯ পৃষ্ঠা অনুবাদ—মোটের উপর বিজাতি-বিদ্বেষ এক অদ্ভুত ব্যাপার। যেখানে চিত্তোৎকর্ষের যত অল্পতা সেখানে এর তীব্রতা তত বেশী। কিন্তু চিত্তোৎকর্ষের এমন স্তর আছে যেখানে এর সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে, ফলে এর অনুভাবকের স্থান লাভ হয় জাতীয়তার উর্দ্ধে। পর-জাতির দুঃখবিপত্তি তখন তার মনে হয় তার নিজের জাতির দুঃখ-বিপত্তির মতো। চিত্তোৎকর্ষের এই স্তরের সঙ্গে আমার প্রকৃতির সহজ যোগ ছিল, আর ষাট বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই এতে আমার সংস্থিতি ঘটেছিল।

---

# বিষয়-সূচী